রাজধানীর নেপথ্যে

নিমাই ভট্টাচার্য

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট । কলিকাতা-১২

RAJDHANIR NEPATHEYA
by
NIMAI BHATTACHARYYA

প্রথম প্রকাশ—১লা বৈশাখ, ১৩৩১

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০-বি ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ : রবীন দত্ত

আট টাকা

'মা শৈলবালা'কে

কিছুকাল কংগ্রেস অফিসের খিচুড়ি খেয়েছিলাম তিনুদার সঙ্গে। তারপর বিয়াল্লিশের আগস্টে কংগ্রেস অফিসে পুলিসের তালা ঝুললে তিনুদা কখনও কখনও রাত্রে দেখা দিত। দেশ স্বাধীন হবার পর লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত দেশকর্মীর মত তিনুদাও হারিয়ে গিয়েছিল জনারণ্যে। বহু চেষ্টা করেও তার খোঁজ পাইনি। তারপর অকস্মাৎ একদিন উদয় হলো আমাদের গোপাল বোস লেনের পোড়ো বাড়ীতে। তিনুদাই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল 'লোকসেবকে'র পঞ্চাননদার কাছে। সেটা উনিশ শ' উনপঞ্চাশের কথা। তারপর তিনুদা আবার উধাও। শুনেছি রাজনীতি ছেড়ে তিনুদা সংসারী হয়ে হাবড়ার বাসিন্দা হয়েছে। ঠিক জানি না। তবে যেখানেই থাকুক আমার সাংবাদিক-জীবনের পথিকৃৎ তিনুদার উদ্দেশ্যে আমার প্রণাম রইল।

এইচ-২২, জংপুরা — **নিমাই**
নিউ-দিল্লী-১৪

এই লেখকের কয়েকটি বই

তোমাকে

ভি. আই. পি.

যৌবন নিকুঞ্জে

ইত্যাদি

এক

মধ্যরাত্রির কিছু পরেই টেলিপ্রিণ্টারে এক ফ্লাশ মেসেজ এলো।

"···Pakistan's newly appointed Prime Minister, Mr. Mohammad Ali, will pass through Calcutta early this morning on his way from Karachi to Dacca."···

ইংরেজি মতে তখন ক্যালেণ্ডারের তারিখ বদলেছে। আর্লি দিস মর্নিং বলতে রাত একটা না দুটো, তিনটে না চারটে, তার কোন ইঙ্গিত ছিল না ফ্লাশ মেসেজে। কোন বিমানে তাঁর আগমন, তারও হদিশ ছিল না 'পি-টি,আই' এর খবরে। এর মাত্র কদিন আগেই নিতান্ত নাটকীয়ভাবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীপদে মহম্মদ আলি নিযুক্ত হয়েছিলেন। লিয়াকত আলি খানের আকস্মিক মৃত্যুর পর জনাব নাজিমুদ্দীন গভর্নর জেনারেল পদ থেকে নেমে এসে প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় রাজনৈতিক দুনিয়ায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেও, সেটা অচিন্তনীয় ছিল না। কিন্তু প্রৌঢ় বয়স্ক নবীন রাজনীতিবিদ মহম্মদ আলির পক্ষে মার্কিন দেশে রাষ্ট্রদূত হওয়া যথেষ্ট ছিল; তাইতো প্রত্যাশিতভাবে প্রধানমন্ত্রীপদে তাঁর নিয়োগে সারা দেশে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

সুতরাং দমদম বিমান বন্দরে সেই সৌভাগ্য চূড়ামণির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের লোভ কলকাতার সাংবাদিকরা কর্তব্য ও আগ্রহের আতিশয্যে সম্বরণ করতে পারেননি। নাইট ডিউটির সব রিপোর্টাররা নানান মহলে খোঁজ খবর করে জেনেছিলেন, প্রত্যুষে পাঁচটা নাগাদ বি-ও-এ-সি বিমানে তাঁর আগমন হচ্ছে দমদমে।

···তখনও এক সপ্তাহ হয়নি, করাচী রেল-স্টেশনে নিয়মিত যাত্রীদের আগমন-নির্গমন সেদিনের মত শেষ হয়ে গেছে। ভোরের আগে আর কোন বাষ্পীয় শকটের আবির্ভাব হবার কথা নয় করাচী স্টেশনে। হঠাৎ মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে একটা ট্রেন স্টেশন প্লাটফর্মে প্রবেশ করল। অভ্যাসমত কুলির দল ঘুম থেকে চট পট

উঠে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারল এটা কোন সাধারণ যাত্রী-গাড়ী নয়; আবার তারা গামছা বিছিয়ে লুটিয়ে পড়ল। প্রাইম মিনিস্টার্স স্পেশ্যাল প্লাটফর্মে থামল। কর্তাব্যক্তিদের ত্বরিত গতিতে এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা, ছুটাছুটি। প্লাটফর্মের নিরাবরণ বক্ষ লাল কার্পেটে মুড়ে দেওয়া হলো। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীন যাবেন লাহোর না রাওয়ালাপিণ্ডি। তাঁরই শুভাগমনের প্রত্যাশায় উচ্চপদস্থ সরকারী ও রেল কর্মচাবীর দল অপলক নেত্রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন··· হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল।···কর্তাব্যক্তির দল মন্থর গতিতে স্টেশন ত্যাগ করলেন; শান্ত্রীর দল রাইফেল কাঁধে করে শিথিল পদক্ষেপে ফিরে গেল তাদের ব্যারাকে। সিগ্‌ন্যালের লাল আলো নীল হলো; প্রাইম মিনিস্টার্স স্পেশ্যাল প্রাইম মিনিস্টারকে না নিয়েই স্টেশন ত্যাগ করল। পোর্টারের দল এগিয়ে এলো, লাল কার্পেট গুটিয়ে রাখা হলো। করাচী স্টেশন আবার ঝিমিয়ে পড়ল।···

···করাচী মহানগরীও তখন নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে শুধু আরব সাগর পারের করাচী বন্দর থেকে আত্মীয়-বন্ধুহীন প্রমত্ত নাবিকদের চীৎকার ভেসে আসছিল। রাষ্ট্রীয় তরণীর নাবিকরাও সে রাত্রে ঘুমুতে পারেননি। সারা রাত্রি চলেছিল শলা-পরামর্শ আর মন্ত্রণা। ব্যর্থতার দোহাই দিয়ে গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে মুক্তি দিলেন জনাব নাজিমুদ্দীনকে; আর সেই তখৎ-এ-তাউসে বসিয়েছিলেন মহম্মদ আলিকে।

দেশ বিভাগের প্রাক্কালে কিছুকালের জন্য বাংলাদেশের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন মহম্মদ আলি। অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীর ঐতিহাসিক রাজত্বকালে সাময়িকভাবে অর্থমন্ত্রী ছিলেন ইনি। সে কারণে কলকাতার রিপোর্টার মহলের সঙ্গে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মধ্য রাত্রির অনেক পরে খবর পেয়েও ভোর পাঁচটা'য় দমদম বিমানবন্দরে কার্পণ্য হয়নি রিপোর্টারদের উপস্থিতিতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি ও পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনের পদস্থ কর্মচারীর

দলও দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য উপস্থিত ছিলেন। আর বিশেষ কেউ ছিলেন না ?

ভোরের আলো তখন সবে ছড়িয়ে পড়লেও সূর্যরশ্মি তখনও ঠিকরে পড়েনি দমদমের লম্বা রানওয়েতে। ঠিক সময় বি-ও-এ-সি প্লেনটি এলো। বিমানের দরজা খুলতেই ভিতর থেকে 'এয়ার হোস্টেস' ইঙ্গিত করে জানালেন, বিমানে ভি-আই-পি রয়েছেন। নিম্ন কর্মচারীর পরিবর্তে পদস্থ কর্মচারীর দলই অধিকতর উৎসাহী হয়ে বিমানে সিঁড়ি লাগালেন। নেহরুর মত ব্যাটন হাতে সহাস্য বদনে বেরিয়ে এলেন মিঃ আলি।

বিমান থেকে নেমে মিঃ আলি এলেন ভি-আই-পি রুমে। পিছন পিছন এলেন প্রধানমন্ত্রীর একজন ব্যক্তিগত কর্মচারী। তরুণ বাঙ্গালী যুবক। আগে রাইটার্স বিল্ডিংস'-এ স্টেনোগ্রাফার ছিলেন। আর এলেন খাকি প্যান্ট ও মোটা সোলার হ্যাট পরে পাকিস্তান সরকারের দেশরক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ ইস্কান্দার মীর্জা। মীর্জা আর ঘরে ঢুকলেন না। বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঘরের ভিতর মিঃ আলির চারপাশে বসে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা রিপোর্টারের দল। একজন বাঙ্গালীকে প্রধানমন্ত্রীরূপে পেয়ে একটু চাপা উত্তেজনা, একটু চাঞ্চল্য। প্রধানমন্ত্রী হয়েও মহম্মদ আলির মুখের হাসিকে অহেতুক গাম্ভীর্য গ্রাস করেনি, দেখে সবাই খুশী। 'স্টেটসম্যান' এর চীফ রিপোর্টারের দিকে ফিরে বল্লেন, "হাউ আর ইউ, মিঃ ডাসগুপ্টা ?" অমৃতবাজারের যতীনদার দিকে ফিরে বল্লেন, 'খবর ভাল তো' ? কলকাতার স্মৃতি রোমন্থন করে জানতে চাইলেন নানাজনের কথা। ডাঃ রায়ের সংবাদ।

তারপর সুরু হলো কাজের কথা। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে মহম্মদ আলি জানালেন, ভারত-পাকিস্তানের মৈত্রীবন্ধন শিথিল হতে পারে না, বরং সে বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। নেহরুজীকে নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতার মত শ্রদ্ধা করেন জানিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার অভিপ্রায়ও মিঃ আলি জানালেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাক রাষ্ট্রদূত ছিলেন মিঃ আলি। রাষ্ট্রদূত পদ থেকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী! কেমন যেন খটকা লেগেছিল অনেকেরই। 'পেন্টাগন' বা স্টেট ডিপার্টমেন্টের কোন হাত ছিল না তো এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে! রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্টারদেরও এই সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, থাকলে যেমন তান্ত্রিক সাধনা সম্ভব নয়, তেমনি আজকের দিনে খবরের কাগজের রিপোর্টার হওয়াও অসম্ভব। তাইতো নির্বিকার ভাবে প্রশ্ন করা হলো···Is it not but a natural that the United States would enjoy some special favour during your Prime Ministreship?···সব সন্দেহ ফুৎকাবে উড়িয়ে দিলেন। সরাসরি এ আশঙ্কা অমূলক বল্লেন। এমন দরদ দিযে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বল্লেন যে, তা অবিশাস্য মনে হলো।

সুদীর্ঘকাল পূর্বপাকিস্তানে কলকাতার অধিকাংশ সংবাদপত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। যুগান্তরের চীফ রিপোর্টার অনিল ভট্টাচার্যই সেকথা পাড়লেন। ঢাকা যেয়েই এ সম্পর্কে খোঁজখবর করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন মিঃ আলি।

সিঁড়ি দিয়ে বিমানে চড়তে গিয়ে হঠাৎ নেমে এলেন। ফটোগ্রাফারদের অনুরোধ করলেন দমদমে গৃহীত ফটোগুলির কপিগুলো যেন তাঁকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সম্মতি জানালেন তারক দাস, শ্যামল বোস ও অন্যান্য ফটোগ্রাফারের দল।

পরদিন প্রভাতী সংবাদপত্রগুলির প্রথম ও প্রধান সংবাদরূপে বেরিয়েছিল মহম্মদ আলির সঙ্গে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকারের বিবরণ। ঢাকা সফরের খবরও নিয়মিত বেরুল। ঢাকা থেকে করাচী উড়ে যাবাব পথে আবার দমদমে আসবেন বলেও খবর ছাপা হলো।

এবার একটু বেলাতেই মিঃ আলির প্লেন দমদম এলো। এয়ারপোর্টে কিছু উৎসাহী লোকও জমেছিল।

'প্রটেকটেড' এরিয়া থেকে ভি-আই-পি রুমে যাচ্ছেন, মিঃ আলি।

পাশে ভিড়ের মধ্য থেকে আধা ময়লা হাফসার্ট পায়জামা-পরা একটি ছোকরা এগিয়ে এলো।

—"কাকা, কাকাবাবু," ছেলেটি ডাকল ?

মিঃ আলি পিছন ফিরলেন। ছেলেটি এগিয়ে এলো। চিনতে পারেন নি মিঃ আলি। ছেলেটিই উৎসাহী হয়ে নিজের কাকার নাম করল। বগুড়ার বাসিন্দা। অতীত জীবনে ছেলেটির কাকার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন মিঃ আলি। ফেলে-আসা দিনের বন্ধুর খোঁজ করলেন মিঃ আলি। জানলেন, বন্ধু উদ্বাস্তু ক্যাম্পের বাসিন্দা। ত্রুটি করলেন না সংসারের আরো পাঁচ জনের কুশল বার্তা নিতে। ছেলেটিকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে আদর করলেন ; করাচীতে চিঠি দিতেও বল্লেন।

গদীর গুণে সারল্য বিসর্জন দেননি মিঃ আলি। দেখে সবাই খুশী।

দলবল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ঘরে ঢুকলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আতিথেয়তা রক্ষার জন্য। এক গেলাস অরেঞ্জ স্কোয়াস হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন সেই চেনা মোটা শোলার হ্যাট পরে মিঃ ইস্কান্দার মীর্জা। দেশ বিভাগের আগে থেকেই দেশরক্ষা দপ্তরের উচ্চ পদে বহাল ছিলেন মিঃ মীর্জা! লম্বা চওড়া চেহারা, মুখখান. বিশালাকায়। স্যার আশুতোষকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বলা হতো। শারীরিক দিক দিয়ে মীর্জাকে বল্লেও অন্যায় বা অত্যুক্তি হতো না কোন দিক থেকেই। বারান্দার একপাশে সরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য আলাপ করলাম। বুঝতে দেরী হলো না মিঃ মীর্জা একজন জাঁদরেল অফিসার। কেন জানিনা, এঁর কাছে মহম্মদ আলিকে কেমন যেন অসহায় মনে হয়েছিল।

পশুরাজ সিংহের সঙ্গে নেংটি ইঁদুরের খেলা নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প আছে। সেদিনই আশঙ্কা হয়েছিল পাকিস্তানের ইতিহাসে মীর্জা-আলি নিয়েও এমনি গল্প লেখা হবে।

আমাদের কৃষ্ণমেননের মত স্বদেশী সাংবাদিক দেখলে ভ্রূ কুঞ্চিত

করতেন না মহম্মদ আলি। প্রেস সাইনেসের বালাইও ছিল না। এবারও রিপোর্টারদের কাছে মধুমাখা এক বিবৃতি দিলেন আগের দিনের সুরে।

নির্দিষ্ট সময় বিশ্রাম করে হাতের সুইস-মেড ছাতিটাকে স্পোর্টস ষ্টীকের মত ঘুরাতে ঘুরাতে প্লেনে উঠতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন মিঃ আলি। আমরা সব পাশেই ছিলাম। আমাদের আগের দিনের আশঙ্কার মূলে কুঠারাঘাত করে বল্লেন, "জেন্টলমেন অফ দি প্রেস! নেভার মাইণ্ড দিস ইজ নট এ্যান আমেরিকান রাইফেল, বাট এ্যান অর্ডিনারী আমব্রেলা।"

সকলের মুখে হাসি ফুটিয়ে বিদায় নিলেন মিঃ আলি।

উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার প্রায় মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে করতোয়া নদী। করতোয়ার পশ্চিমে শেলবর্ষ পরগনার কুন্দগ্রামের জমিদার ছিলেন নবাব আবদুল সোহবান চৌধুরী। নবাব-নন্দিনী আলতাফান্নেসার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল নবাব আলি চৌধুরীর। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এককালে মন্ত্রীত্ব করেছেন বাংলাদেশে। এঁদেরই পুত্র হলেন মহম্মদ আলির পিতৃদেব নবাবজাদা আলতাফ আলি চৌধুরী। এক ময়মনসিংহ-দুহিতার সঙ্গে আলতাফ আলি চৌধুরীর প্রথম বিয়ে হয়। তাঁরই গর্ভের পাঁচটি পুত্রের প্রথমটি হলেন মহম্মদ আলি। আলতাফ আলি মহম্মদ আলির গর্ভধারিণীকে তালাক দিয়ে সাগর-পারের এক কটা সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। পূর্বতন আলতাফ বেগমেও মালা জপ করে জীবনের অবশিষ্টাংশ কাটাননি। তিনিও এক ব্যারিষ্টারের সঙ্গে নিকায় বসেছিলেন!

সাধারণভাবে ভদ্রবিনয়ী থাকলেও আলতাফ আলি শনিবারের বারবেলায় বা রবিবারের প্রাক্-গোধুলিতে খিদিরপুরের ঘোড় দৌড়ের মাঠের সঙ্গে গাঁটছড়া না বেঁধে থাকতে পারেননি। লক্ষ লক্ষ টাকা ঘোড়ার খুরের ধুলায় উড়িয়েছেন। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে হস্তান্তরের দলিলে দস্তখতের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বহু বাড়ী

চৌধুরী পরিবারের হাতছাড়া হয়েছে। 'স্লো হর্স এণ্ড ফাস্ট উইমেনের' কৃপায় আলতাফ আলি মৃত্যুকালে লক্ষাধিক টাকা দেনা রেখে গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। সম্ভবতঃ আরো পাঁচজন ধনীর মত সে অর্থ পরিশোধ করা হয়নি।

আলতাফ আলির ফিরিঙ্গি পত্নীর গর্ভের প্রথম সন্তান হলেন ওমর আলি। লেস-বসানো জরি-আঁটা লক্ষ্ণৌ চিকনের পাঞ্জাবি পরে সন্ধ্যায় তানপুরা হাতে নিয়ে বসেছেন ওমর আলি। পরে কলকাতা বেতার কেন্দ্রেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিছুকাল। আরো পরে নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদ আলি যখন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী, তখন সুরাবর্দীব পক্ষে ভ্রাতৃবিদ্বেষ প্রচার করে পাক রাজনীতিতে খ্যাতি অর্জন করেন।

করাচী থেকে দীর্ঘ পথ উড়ে মহম্মদ আলি নয়াদিল্লী এসেছিলেন। আনন্দভবন-নন্দনকে দাদা বলে ডেকেছিলেন। কাশ্মীরের ফয়সালা করার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু শুধু মুখে হাসি দেখিয়েই করাচী ফিরেছিলেন। কাজের কাজ কিছু হয়নি।

মহম্মদ আলির নিয়োগ-কালীন আশঙ্কার বুদবুদ শুধু মধুমাখা বিবৃতিতেই তিরোহিত হয়নি। পলাশীর আম্রকুঞ্জে যেমন একদিন ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছিল, মহম্মদ আলির প্রধান মন্ত্রিত্ব কালেও তেমনি পাকিস্তানে মার্কিনী আধিপত্যের বীজ বপন ও তাকে পল্লবিত করার প্রচেষ্টা 'সিয়াটো' ও 'বাগদাদ' প্যাক্টে দস্তখত করেছিল। অনাগত ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা 'গান এ্যাণ্ড গোল্ডের দেশ,' আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানেব মৈত্রী কিভাবে গ্রহণ করবেন তা আমাদের অজ্ঞাত হলেও একথা নিশ্চিত যে মহম্মদ আলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিশ্চয়ই অস্বীকৃত হবে না। এঁরই রাজত্বকালে পাকিস্তানের উর্বরা ভূমিতে 'সিভিলিয়ান' পলিটিসিয়ানদের জন্ম হয়! খাকি পোষাক, মোটা শোলার হ্যাট মেজর জেনারেল উপাধিকে নির্বাসন দিয়ে ইস্কান্দার মীর্জা দেশ সেবার ঝুটা নামাবলী গায়ে জড়িয়ে পূর্ব বাংলাকে সায়েস্তা করার

জন্য লাট সাহেব হয়েছিলেন!…স্বাস্থ্যের অজুহাতে অতীত নেতৃবৃন্দের মত কায়েদ-ই আজমের স্মৃতিবিজড়িত গদীতে ইস্তফা দিতে হয়েছিল গোলাম মহম্মদকে। মহম্মদ আলিও বেশী দিন সুখে কাল কাটাতে পারেননি। মীর্জার ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য ও মুসলিম লীগের অন্তর্কলহ ঈষাণ কোণের মেঘের মত মহম্মদ আলির অন্তর নিত্য আশঙ্কিত করে তুলছিল। পাকিস্তানী রাজনীতির অন্যান্য বহু আশঙ্কার মত এ আশঙ্কাও সত্য হলো! মীর্জা গভর্ণর জেনারেল হলেন! মার্কিনী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মধুর বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে 'সিয়াটো' প্যাক্টের প্রিমিয়াম দিলেন।

মহম্মদ আলিও 'বাপকো বেটা সিপাহীকো ঘোড়া'র মত প্রথমা বেগমকে তালাক দিলেন! এক বিদেশিনীকে গাউন ছাড়িয়ে শাড়ী পরিয়ে হৃদয় সঁপে দিলেন। জীবন-যৌবন নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলেন মহম্মদ আলি। জীবনের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘর-বাড়ীর নতুন চেহারা সৃষ্টিতে মন দিলেন। সারা বাড়ী লাইট লাইমজুস কলারে ডিসটেম্পার করা হল। ভিতরের লনে সুইমিং পুল তৈরী আরম্ভ হলো। কিন্তু রাজমিস্ত্রীদের কাজ শেষ না হতেই রাজত্বের পরিবর্তন ঘটল। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের ধ্বজা আর একবার নড়ে উঠল। উড়ে এসে জুড়ে বসলেন সিভিলিয়ান কাম-পলিটিসিয়ান চৌধুরী মহম্মদ আলি।

মহম্মদ আলি আবার পাক রাষ্ট্রদূত হয়ে ডালেস-তীর্থে ফিরে গেলেন।

পৃথিবীর মধ্যে পাকিস্তান একমাত্র দেশ যেখানে সব আশঙ্কা বাস্তবে দেখা দেয়। তাছাড়া আর এক দিক দিয়ে পাকিস্তান পৃথিবীর মধ্যে বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারে! যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের মন্ত্রীত্ব বদলের ইতিহাসকেও লজ্জা দিয়েছে পাকিস্তান। প্রায় মিস (?) কিলারের প্রমোদসঙ্গী পরিবর্তনের মত পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বে নিয়মিত পরিবর্তন হয়ে আসছে। তাইতো ইস্কান্দার মীর্জাকেও আর্মি অফিসারদের রিভলবারের নিঃশব্দ ইসারায়

গভর্ণর জেনারেলের গদী ত্যাগ করে লণ্ডনে শাম্মীকাবাব—মোরগ মোসল্লামের দোকান খুলে বসতে হলো। কানপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের 'একদা বাসিন্দা আয়ুব খাঁ এবার পাকিস্তানী রঙমহলে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

সৈন্যবাহিনীকে দিয়ে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়েছিলেন জেনারেল আয়ুব। তাইতো ধুরন্ধর আয়ুব ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ইঙ্গিত উপলব্ধি করেছেন। পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল মুসাকে আয়ুব সুনজরে দেখতে পান না বলে জনশ্রুতি আছে। তার প্রমাণও পাওয়া যায়। ছায়ার মত অনুসরণ করার মহান দায়িত্ব দিয়ে আয়ুব নিজ পুত্রকে জেনারেল মুসার এ-ডি সি করে রেখেছেন। তাছাড়া পাকিস্তান আর্মি মুভমেণ্ট কণ্ট্রোলের যিনি হর্তাকর্তাবিধাতা, তিনি নাকি আয়ুবের ছাত্র জীবনের অতি বিশ্বস্ত বন্ধু। সুতরা জেনারেল মুসার এক পা নয়, দু' পা বাঁধা।

যাহোক কালক্রমে পাক-রাজনীতিতে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলেন মহম্মদ আলি। আয়ুব-ভ্রাতা সদার বাহাদুর খানের কথা যদি সত্য হয়, তবে অতলান্তিক পাড়ের রিমোট কণ্ট্রোল সিস্টেমেই এইসব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন পাকিস্তানে সম্ভব হয়।'

তার পরের কাহিনী দীর্ঘ নয়। স্বয়ং খোদাতালার ইঙ্গিতেই মহম্মদ আলি এবার আয়ুব-ক্যাবিনেট থেকে বিদায় নেন।

মহম্মদ আলির শূণ্য গদী দখল করলেন পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচাইতে এ্যাগ্রেসিভ ফরেন মিনিস্টার মিঃ জেড্, এ, ভুট্টো।

দুই

ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি; সেই সঙ্গে হারিয়েছি ঘরের আকর্ষণ। মরুপ্রান্তরে তাঁবু ফেলে না বেড়ালেও, যাযাবর বৃত্তি আমার মজ্জাগত। কাউকে বা হতাদরে বলতে শুনেছি, গোল্লায় গেছি,

কেউ বা বাউণ্ডুলে বলে তিরস্কার করেছেন। শরৎ চাটুজ্যের কোন নায়িকা জীবনে এলে হয়তো ছুটি হাত চেপে ধরে, চোখের জলের বন্যা বইয়ে আমার যাযাবরবৃত্তির যবনিকা পাত করিয়ে অন্নপূর্ণার মন্দির গড়ে তুলতেন ; কিন্তু তাও হয়নি। তাই বিলের গরু বদরের শিন্নির মত যত্র-তত্র আমার বিচরণ। কখনও ট্রাম কণ্ডাকটারদের আখড়ায় ঢোল বাজিয়ে গান শুনেছি, কখনও লালবাজারের চত্বরে বসে সমাজ জীবনের এক বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করেছি, কখনও বা সান্ধ্যকালীন মদ্যপানের আসরে প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষসিংহদের বেলেল্লাপনা দেখেছি।

কলকাতার রিপোর্টারদের কাছে রাইটার্স বিল্ডিংস হচ্ছে যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী। রিপোর্টার হবার পর ছন্নছাড়া জীবনের এক বিশিষ্ট অংশ এখানে কাটিয়েছি কারণে-অকারণে। মন্ত্রীদের ঘরে মজলিশ করে যেমন আনন্দ পেয়েছি, তেমনি মজা পেয়েছি শঙ্কর গুপ্ত-অমর মুখার্জীর 'লাঞ্চ-পার্লামেন্টের মেম্বার হয়ে। হেমদার বেয়ারার পুত্রশোকের সংবাদ সাধারণভাবে রিপোর্টারের কাছে আকর্ষণীয় না হলেও প্রাণে যে নাড়া খেয়েছিলাম, তা আজও ভুলিনি।

নানা কারণে হেমদার ঘরের আকর্ষণ ছিল। চারিত্রিক মাধুর্যে হেমদা সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন। ওর চাইতে ডেমোক্রাট মন্ত্রী আজ পর্যন্ত 'রাইটার্স বিল্ডিংস' এ নিশ্চয়ই আসেননি। এরপর ছিল কফি ও পান। কফি সেবন করে হেমদাকে ধন্য করতে না করতেই প্লেটে করে আসতে ছুটি পান ও বেনারসী জর্দা-কিমাম-মিষ্টি সুপারীর তিনটি রৌপ্যাধার। ভট্চাজ ব্রাহ্মণ। যতই স্যুট-টাই পরি না কেন, স্ট্যাগ ডিনার বুফে লাঞ্চ যতই খাই না কেন, ককটেল পার্টিতে ঘুরি না কেন, ব্রাহ্মণ বংশের ধারাটা যাবে কোথায় বলুন? অঙ্গার শত ধৌতেন··। ছুটি পান মুখে পুরে আর ছুটি হাতে করে বেরিয়ে আসি।

রিপোর্টারের দল রাইটার্স বিল্ডিংস যায় খবরের সন্ধানে। 'নিউজ' ফেলে মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবার লোভও আমার কম

নয়। হেমদার কাছে খবর পাওয়া যেত না, একথা সবার জানা ছিল। তবুও সবাই আসতেন, আমিও যেতাম। শুধু তাই নয়; তিনিও আসতেন আমার কাছে। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি হেমদার অদৃষ্টে জুটেছিল; কিন্তু মন তাঁর শূন্য ছিল। সন্তানের দ্বারা সংসার-জীবনের যে পূর্ণতা আসে, তা হেমদার অদৃষ্টে জোটেনি। তাইতো অনেক আনন্দের দিনেও তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠত না। আমাদের প্রতি কেমন যেন বাৎসল্য প্রকাশ করতেন যখন তখন।

কিছুকাল রোগভোগের পর ডাক্তারের নির্দেশ অমান্য করে টো-টো করে ঘুরে বেড়াই। তার জন্য আমার কোন উদ্বেগ না থাকলেও হেমদার অশ্বস্তির অন্ত ছিল না। আর্কেডিয়া গার্ডেনে একদিন এক সন্ধ্যাকালীন পার্টিতে হেমদার সঙ্গে দেখা। গরম না পড়লেও শীত তখন বিদায় নিয়েছে। গায়ে গবম জামা নেই দেখে হেমদার কী ভীষণ রাগ। ভ্রূ কুঞ্চিত করে বল্লেন, গরম জামা পরে অফিস যাও; ঠাণ্ডা লাগলে কী হবে সে খেয়াল তো বাবুর নেই।

কোনদিন আবার ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বলতেন, বাবুর কি খবর? আজকাল খুব ব্যস্ত নাকি?

—না তেমন আর কি।

—তবে চৌরঙ্গী পাড়ায় ঘুরে না বেড়িয়ে চল কাল সুন্দরবন ঘুরে আসি।

ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের লঞ্চে করে হেমদার সান্নিধ্যে দক্ষিণবাংলার নদী-নালা বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি বহুবার। ঝুড়ি ভর্তি খাবার নিতেন হেমদা। চায়ের সরঞ্জাম, কফির ব্যবস্থা, পানের বাণ্ডিল, কিমাম-জর্দা-হরিতকী-সুপারী, এ্যানাসিন ট্যাবলেট, ডেটলের শিশি মায় দাঁত খোঁচাবার জন্য টুথ-পিক্ পর্যন্ত সঙ্গে নিতেন হেমদা। নিজে খেতে না পারলেও অপরকে ভুরিভোজে আপ্যায়িত করে তৃপ্তি পেতেন হেমদা।

সি আর দাশ ও জে এন সেনগুপ্তের আমল থেকে কংগ্রেসের পাণ্ডা হলেও হেমদা কোনদিন গান্ধীটুপি ব্যবহার করতেন না।

লঞ্চের এক সহযাত্রীর গান্ধীটুপিটা নিজের মাথায় চাপিয়ে লাঠি ঠুকে হেমদা বললেন, এ্যাটেনশন প্লিজ, হিয়ার ইজ ইওর প্রেসিডেণ্ট ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ।

তাক লেগে গেল সবার। সত্যি, টুপি চাপালে হেমদাকে আর চেনা যেত না—যাস্ট লাইক রাজেন্দ্র প্রসাদের মত দেখতে লাগত। মুখের আকৃতি ও রঙ দুজনেরই প্রায় একরকম ছিল; তাছাড়া কাঁচা-পাকা গোঁফ জোড়াই কিস্তিমাৎ করত।

একটু পোজ্ দিয়ে হাঁক দিতেন, ওহে রিপোর্টার হোয়ার ইজ ইওর ফটোগ্রাফার ?...

—ফটোগ্রাফার ত নেই দাদা।

—হোপ্লেস।

রাইটার্স বিল্ডিংস-এ কত মন্ত্রীরই আগমন নির্গমন হয়। কিন্তু মনে রেখাপাত ত সবাই করতে পারেন না। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার ঐতিহাসিক 'রায়' দিয়ে পান্নালাল বসু সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনাও করেছিলেন কিছুকাল। জীবন-সায়াহ্নে শিক্ষামন্ত্রীর আসনে আসীন হয়েছিলেন ডাঃ রায়ের আগ্রহে। সাধারণ রাজনৈতিক মহলে পান্নালালবাবু বিশেষভাবে উপেক্ষিত হতেন। রাজনৈতিক নোংরামিতে ইনি কৃতিত্বের অধিকারী হননি বলেই বোধহয় এই উপেক্ষা তাঁর অদৃষ্টে জুটেছিল। অধিকাংশ রিপোর্টারই পান্নালালবাবুকে এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু কি জানি কেন, তাঁর প্রতি আমার অসম্ভব দুর্বলতা ছিল।

নির্বিকারচিত্তে ফাইলে নোট দিচ্ছেন বা কোন চিঠির খসড়া করছেন, এমন সময় অর্ডালী বা বেয়ারাদের কেউ ঘরে ঢুকলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেন পান্নালালবাবু। জিজ্ঞাসা করতেনঃ কিছু বলবেন ?

মন্ত্রী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে 'আপনি' সম্বোধন করছেন দেখে বেয়ারারা লজ্জিত হয়ে উঠত। কিন্তু মন্ত্রী লজ্জিত হতেন না। মানুষকে তিনি মানুষই গণ্য করতেন। দশটা বাজতে না বাজতেই

অফিস আসতেন। প্রত্যেই দিন ঘণ্টা দুই ধরে বিভিন্ন পত্রের উত্তর দিতেন। কোন নগন্যতম প্রাথমিক শিক্ষক বা সহায়সম্বলহীন বিধবার পত্রের উত্তর দিতেও কালবিলম্ব করতেন না। ফাইল-পত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত না পড়েও নোট দিতেন না পান্নালালবাবু। অফিসারদের উপর অন্ধবিশ্বাসে কোন ফাইলে বা আদেশে দস্তখত দিতেন না ইনি।

তাছাড়া দরখাস্তে বা ফাইলে কোন ভুল নোট থাকলে ভীষণ রেগে যেতেন। একদিন ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বলে উঠলেনঃ দেখুন তো মশাই, এটা কি ইংরেজি হয়েছে?

দেখি একজন ভুল ইংরেজি লিখেছেন একটা ফাইলে। আর কি বলব! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাচ্ছি।

পয়সা-কড়ি দিয়ে এঁরা লেখাপড়া শিখেছেন কিনা সন্দেহ। ইংরেজি না জানেন বাংলায় ত লিখতে পারেন, তাতে ত কোন দোষ নেই। কিন্তু তাই বলে ভুল লিখবেন কেন?

ঘণ্টা বাজালেন, গদাধর এলো। ফাইল ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন।

শিক্ষা জগতে 'আহা মরি' কিছু করতে না পারলেও, ব্যক্তিগত ভাবে পান্নালালবাবু সব অন্যায় ও দুর্নীতির উর্ধ্বে ছিলেন। মন্ত্রী হবার পর একটা সরকারী মোটর তাঁর বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু কোন দিনের জন্যও তিনি সে মোটরগাড়ী নিজের স্ত্রী বা পুত্রদের ব্যবহার করতে দেননি। বোধকরি আর বিশেষ কোন মন্ত্রী নেই, যিনি হলপ করে বলতে পারেন, সরকারী মোটর গাড়ী তাঁদের পুত্র-কন্যারা ছাড়াও ভাগনে বা জামাইরা ব্যবহার করেন না।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পান্নালালবাবুর যথেষ্ট পড়াশুনা ছিল। নিদেনপক্ষে হাজারখানেক রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গান তাঁর মুখস্থ ছিল। রাইটার্স বিল্ডিংস-এ রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গান জানা লোক দুর্লভ না হলেও সুলভ নয়। এ কথা সবাই জানেন। তবুও সেখানে বসে দিনের পর দিন অফুরন্ত রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতা শুনতে বেশ লাগতো।

হাতের কলমটা নামিয়ে রেখে বলতেন : আজকাল আর ঠিক পড়াশুনা হচ্ছে না মশাই। রবিবাবুর কবিতাগুলোই আওড়াতে পারি না, কি অদৃষ্ট বলুন তো ?

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকবার পরেই বলতেন :

…"সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি মাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন ; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর ; তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল !—যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।"…

কি লিখেছেন বলুন তো ! আচ্ছা তার পরের লাইনটা কি যেন ? স্মৃতিশক্তি রোমন্থন করে অতি কষ্টে বলি—সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর…

—না, না ভুল হলো। মনে পড়েছে :

'বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা।'

তারপর আপনার ঐ 'সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর—।'

আবার বলতেন : অনেক কবির কবিতাই তো পড়লাম, কিন্তু কাউকে তো বলতে শুনিনি 'গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।' মশাই ঋষি না হলে এমন কথা কেউ লিখতে পারেন ! তাছাড়া কোন কবিই বা এমন বলিষ্ঠ ভাবে বলতে পেরেছেন—

সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ও ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিত হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে, উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
সে মস্তক ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক।'

আমি চুপচাপ বসেই থাকি। নিজের মনে নিজেই বলতে

থাকেন, শিবাজী উৎসবের কবিতাটিব সবটা আপনার মুখস্থ আছে ?

—না, বোধহয় সবটা নেই।

—না কি মশাই, মুখস্থ করবেন। এমন কবিতা আর হয় না। ফাইলের ফিতা বাঁধতে বাঁধতে বলেন—

'মরে না, মরে না, কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায় অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না ট'লে।
যারা ভেবেছিল মনে কোন কালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্মপরপারে,
এল সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি বেশ
ভারতের দ্বারে।
আজো তার সেই মন্ত্র,—সেই তার উদাত্ত নয়ান
ভবিষ্যতের পানে
একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কী দৃশ্য মহান।
হেরিছে কে জানে।
অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্তি লয়ে
আসিয়াছ আজ,—
তবু তব পুবাতন সেই শক্তি আনিয়াছ আজ
সেই তব কাজ !
সেদিন শুনিনি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন,—
দরিদ্রের বল
"এক-ধর্মরাজ্য হবে এ ভারত"—এ মহাবচন
করিব সম্বল।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনতে অসম্ভব ভালবাসতেন পান্নালালবাবু। যশস্বী রবীন্দ্র-সঙ্গীতশিল্পী বিমলভূষণের বাড়ী যেতেন মাঝে মাঝেই সে তৃষ্ণা মেটাবার জন্য। কয়েকখানা গান শুনবার পর বলতেন, হ্যাঁ মশাই সেই গানটা করুন তো, যার একটা লাইন হচ্ছে, 'আসবে পথে আঁধার নেমে, তাই ব'লেই কি রইবে থেমে,...আবার কখনো বলতেন, 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়্‌বো না মা' গানটি করবেন মশাই। এমনি ভাবে ডজন ডজন গান শুনবার পর বলতেন, হ্যাঁ মশাই যদি কিছু মনে না করেন তো 'তাসের দেশে'র 'হরতন রুইতন' শুনিয়ে দিন। বড় চমৎকার 'সিম্বলিক' গান।

অহেতুক কোন আত্ম-মর্যাদা-বোধ পান্নালালবাবুর চরিত্রে দেখতে পাইনি। আদর্শবান ও উচ্চ-শিক্ষিত এবং সর্বোপরি মার্জিতরুচি-সম্পন্ন যুবক শঙ্কর গুপ্ত ছিলেন পান্নালালবাবুর 'কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল এ্যাসিস্‌টেন্ট।' পান্নালালবাবু জানতেন শঙ্করবাবুর যথেষ্ট পড়াশুনা আছে। তাই কোন বিষয়ে একটু খট্‌কা লাগলেই শঙ্করবাবুব সাহায্য তলব করতেন। নির্বিকারভাবে বলতেন: এটা কি হবে মশাই একটু বলে দিন তো। অথবা ওঁর বানানটা বোধ হয় ঠিক নেই। 'কারেক্ট, করে দিন তো। কোনদিন বা হয়ত জিজ্ঞাসা করতেন 'অমুক লেখকের কোন লেখাটা ভাল লাগে বা ঐ বইটাতে কি আছে যেন?'

অমর মুখার্জীও পান্নালালবাবুর অন্যতম ব্যক্তিগত কর্মচারী ছিলেন কিছুকাল। অমরবাবুর স্ত্রীর একবার একটা অপারেশন হয়। উদ্বিগ্নচিত্তে পান্নালালবাবু হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষা করেছিলেন অপারেশনের খবর নেবার জন্য।

এমন দিনও গেছে, যখন স্বেচ্ছায় ব্যাগ থেকে টাকা বের করে আমাকে দিয়েছেন সিনেমা বা থিয়েটার দেখবার জন্য।

"কাগজে দেখলাম, সেক্সপিরিয়ন পার্টি এসেছে। আমার তো সময় নেই, আপনি দেখে এসে বলবেন কেমন হয়েছে। ভাল ভাবে খেয়াল করবেন, কোর্ট সিনে শাইলক-ব্রুটাসের কথাবার্তা।"

প্রথম প্রথম সঙ্কোচে এইসব 'অফার' গ্রহণ করতে লজ্জিত হতাম। আমার মনোভাব বুঝতে পেরে একদিন বলেছিলেন, আপনি আমার টেনথ্ ছেলের সমবয়সী হবেন। সুতরাং আমার কাছে লজ্জা করবেন না।

তারপর থেকে আমিও লজ্জা পেতাম না। বন্ধুবান্ধব সিনেমা দেখাতে ধরেছে অথচ পকেট গড়ের মাঠ। এক দৌড়ে পান্নালাল-বাবুর কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে এসেছি। সিনেমা দেখেছি। হঠাৎ কতদিন আমার বাড়ী গেছেন। অনেকদিন তালাবন্ধ দেখে ফেরত এসেছেন। পরদিন রাইটার্স বিল্ডিংস-এ এলে বলেছেন, কাল আপনার বাড়ী গিয়েছিলাম। কেউ ছিলেন না।

ভীষণ লজ্জিত বোধ করেছি।

—লজ্জার কি আছে মশাই। আমি তো আপনাকে খবর দিয়ে যাইনি, সুতরাং দোষ আমারই। হাতে সময় ছিল আর আপনার বাড়ীর পাশ দিয়েই যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম একবার ঘুরে যাই।

কোন দিন আবার বলেছেন ঃ বিয়ে করার আগে নিজে মেয়ে দেখবেন মশাই। কথাবার্তা বলতে বলতে গলা, চিবুক, হাত ও পায়ের গঠন লক্ষ্য করবেন। মেয়েদের গঠন দেখেই স্বভাব জানা যায়, সে কথা জানেন তো!

আমার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

—হাসির কি আছে মশাই! ব্রাইট ইয়ংম্যান, সারা জীবন যাঁর সঙ্গে সংসার করবেন, তাঁকে ভালভাবে দেখে নেবেন না?

এককথায় সব মিলিয়ে এমন পূর্ণাঙ্গ একটি মানুষ আমার কেন বহুজনের জীবনে আসে না। তবুও এমন পূর্ণাঙ্গ মানুষটিকেও নিন্দাবাদ শুনতে হয়েছে এ্যাসেম্বলীতে। ডাঃ অতীন বসুর মতন একজন আদর্শব্রতী উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এঁটে "ঠুটো জগন্নাথ" বলে তিরস্কৃত করেছিলেন এ্যাসেম্বলীতে। বিরোধী পক্ষের আসনে বসে অতীনবাবুর মতন একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় গুণীব্যক্তিও মানুষ চিনতে চান নি, এটাই দুঃখের বিষয়।

পান্নালালবাবু আজ মারা গেছেন। যে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিদ্যাসাগরের মর্মরমূর্তি বায়সকুলের দ্বারা কলঙ্কিত হচ্ছে, যে বাঙ্গালী শিবনাথ শাস্ত্রী—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতির নাম ভুলতে বসেছে, যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কফি-হাউসের চত্বরকে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের পলাশীর প্রান্তর করে তুলেছে, সে দেশ পান্নালালবাবুর মতন একজন শিক্ষামন্ত্রীকে ভুলে গেছে বা নিকট-ভবিষ্যতে ভুলবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ফরাসী দেশের মহাদুর্দিনে রাজা এক্কা-দোক্কা খেলেছিলেন, সৈন্যাধক্ষ্য 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ' করে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং পলাশীর আম্রকুঞ্জে পরাজয় বরণ করার পর পরাভূত সৈনিকদল সারারাত্রি যাত্রাগান শুনেছিলেন। কেন জানি না, আজকের বাংলাদেশ দেখে ইতিহাসের এইসব পুরানো ইতিবৃত্ত আবার মনে হচ্ছে। আমি নিরুপায়।

তিন

কোন অজ্ঞাত কারণে স্বর্গ থেকে শ্লিপ করে যে সব দেবতা এই মর্তভূমিতে ছিটকে পড়েন, তাঁরাই মিনিস্টার। এঁরা মর্তবাসীর নমস্য, এঁরা উপাস্য; এঁদের ভজন-ভোজন করানই মনুষ্যকুলের কাজ। একদল চাপরাশী, বেয়ারা, অর্ডালী, হেড জমাদার, পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্ট, কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক, অ্যাসিসটেন্ট প্রাইভেট সেক্রেটারি, অ্যাডিসনাল প্রাইভেট সেক্রেটারী ও প্রাইভেট সেক্রেটারীর অলঙ্কার-ভূষণে ভূষিত হয়ে মন্ত্রীপ্রবরদের দেখে আমাদের দেবদর্শনের পুণ্যলাভ হয়। এম-পি, এম-এল-এরাও কম নন। এঁদের হাঁচি-কাশিতেও নাকি মন্ত্রীদের স্বর্গরাজ্য কেঁপে ওঠে; সুতরাং এঁদেরও টাচ করা দায়। একেবারে ফোর-ফর্টি ভোল্টস! এ পর্যন্ত হলেও না হয় সহ্য হতো। কিন্তু দিন কাল এমনই পড়েছে যে, মফস্বলের মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের ল্যাজে হাত দেওয়াও অসম্ভব! তিরিশ থেকে চল্লিশ, চল্লিশ থেকে আটচল্লিশ

কোটি হয়েছি আমরা ; কিন্তু এই জনারণ্যের মধ্যে সত্যকার মানুষ খুঁজে পাওয়াই দায়। কলকারখানার মত স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ছেলেমেয়ে বেরিয়ে আসছে, কিন্তু বিদ্বান কজন ? পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার গর্ব করি, গর্ব করি বেদ-বেদান্ত উপনিষদের দেশের মানুষ বলে, কিন্তু আচার-ব্যবহার চিন্তায় সত্যকার ভারতীয় আবিষ্কার করতে তো হাঁপিয়ে পড়তে হয়। তাইতো সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ একটি বিস্ময়।

কত নেতাই তো দেখলাম, কিন্তু এমন নিরহঙ্কার মানুষটি আর পেলাম না। সহজ সরল জীবনযাত্রায় একমাত্র লালবাহাদুর শাস্ত্রী ছাড়া এঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই, একথা প্রায় হলফ করে বলা যায়।

কিং এডওয়ার্ড রোড ছেড়ে রাষ্ট্রপতি-ভবন যাবার পর দেখি একটা সুন্দর বিছানায় অর্ধশায়িত হয়ে পড়ছেন। দৃশ্যটা অবশ্য সেই একই ; বিছানা থেকে শুরু করে চেয়ার-টেবিল, টিপাই, সোফা সর্বত্রই শুধু বই। চারদিক ঘুরে-ফিরে দেখে-শুনে বল্লাম, রাষ্ট্রপতি-ভবনে আসার পর আর তো নতুন বিশেষ কিছু নজরে পড়ছে না, তবে বিছানাটা যেন একটু বেশী ঝকঝকে, খাটটা যেন একটু বেশী দামী।

শায়িত অবস্থা থেকে হঠাৎ উঠে বসলেন। বল্লেন, হোয়াট ! ইউ ডোণ্ট নো ছাট আই এ্যাম নাউ প্রেসিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। তোমাদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করি বলে দাম দাও না, তাই না !

হো হো হেসে উঠলেন। আমিও চাপতে পারলাম না হাসি।

বাহুল্যবর্জিত জীবনযাত্রা সর্বপল্লীর ধর্ম। সেই সাধারণ ধুতি, একটা মামুলি শার্ট। আর দশ-পনের টাকার এক জোড়া পামসু জুতো। সভা-সমিতির জন্য অবশ্য এর উপরেই চড়ান একটা লম্বা কোট আর সেই সাদা পাগড়ি। কোন বিদেশী অতিথি না এলে ড্রইংরুমের সোফায় বসতে আজ পর্যন্ত দেখিনি। শুনেছি, মিনিস্টার হবার পর অনেকেই ভেজিটেরিয়ান থেকে নন-ভেজিটেরিয়ান

হয়েছেন, চিকেন রোস্ট না হলে নাকি এঁদের তৃপ্তি হয় না। রাধাকৃষ্ণণ কিন্তু আজও একটু সম্বর, একটু ভাজা, একটু ঘী ; মিষ্টি-ফলও না। সরকারী আহার-উৎসবে এরপর একটা ভেজিটেবল চপ। ব্যস, আর কিছু না।

ইদানীংকালে পার্সোনাল স্টাফের বহর দেখিয়েই বহু নেতা তাঁদের নিজের প্রেষ্টিজ-প্রতিপত্তি রক্ষা করেন। কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি হবার পর কোন প্রাইভেট সেক্রেটারি নিয়োগ করলেন না সর্বপল্লী। সরকারী আমলাতন্ত্র থেকে দু-একবার চাপ এসেছিল। রাধাকৃষ্ণণ জানিয়ে দিয়েছিলেন, প্রাইভেট সেক্রেটারী অ্যাপয়েন্ট না করেও যদি কাজ চলে যায় তবে তার জন্য অযথা অর্থব্যয় কেন? আর প্রেষ্টিজ! প্রাইভেট সেক্রেটারী দেখিয়ে প্রেষ্টিজ বাড়াবার পাত্র আমি নই। বিনা প্রাইভেট সেক্রেটারীতেই ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ দশ বছর উপ-রাষ্ট্রপতির কাজ চালিয়ে গেলেন।

ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাধাকৃষ্ণণ বহুবার বিদেশে গিয়েছেন। দু-একজন পার্সোনাল স্টাফ সঙ্গে নিয়ে যাবার অধিকার তাঁর ছিল ; কিন্তু নিতেন না। বলতেন, প্লেন থেকে নামার পরই তো এম্বাসীর লোক পাব, সুতরাং দিল্লী থেকে লোক নিয়ে অযথা সরকারী অর্থ ব্যয় করি কেন? ক'বছর আগে এমনি ভাবে একলা একবার বিদেশ গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নেহেরু তখন স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, অন্ততঃ একজন পার্সোনাল স্টাফ সঙ্গে নিতেই হবে। এরপর বাধ্য হয়ে শেষের দিকে বার দুই একজন পার্সোনাল স্টাফ সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

রাধাকৃষ্ণণের বৈশিষ্ট্য বহু। সরকারী সফরে গিয়ে লাটপ্রাসাদে থেকে অশোকস্তম্ভমার্কা গাড়ী চড়ে ঘুরে বেড়াবার মোহ প্রায় সব ভি-আই-পির মধ্যেই দেখা যায়। ইদানীংকালে অবশ্য লাটপ্রাসাদের পরিবর্তে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের অতিথি হবার প্রতি মিনিস্টারদের বেশী আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ভাইস-প্রেসিডেন্ট হবার পর ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ কলকাতায় গেলে রাজভবনে থাকতে পারবেন না বলে

সরকারী দপ্তরে জানিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, শরৎ ব্যানার্জী রোডের মজুমদার গৃহের সঙ্গে তাঁর বহুদিনের সম্পর্ক। কলকাতায় গিয়ে বন্ধুগৃহের পরিবর্তে লাটপ্রাসাদে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আমলাতন্ত্রের বড়কর্তারা ভ্রূ কুঁচকে ছিলেন ; কিন্তু তাতে সর্বপল্লীর মতের পরিবর্তন হয়নি। রাষ্ট্রপতি হবার পর সরকারী নিয়ম-কানুন আদব-কায়দা প্রোটোকল রক্ষা করতেই হয়। এর নাকি গত্যন্তর হয় না। তবে রাষ্ট্রপতি হবার পর রাষ্ট্রপতি-ভবনের স্বরূপও বদলেছে। অফিসারদের হরির লুঠ আজ নাকি বহুলাংশে সংযত। রাষ্ট্রপতি-ভবনের মোটরগাড়ী আজ আর দিল্লীর সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে নজর পড়ে না। গাড়ীর সংখ্যাও অনেক কমে গেছে ; উদ্বৃত্ত গাড়ী সরকারী দপ্তরে ব্যবহারের জন্য দিয়ে দিয়েছেন রাধাকৃষ্ণণ।

আরাবল্লী পাহাড়ের লাল পাথরে মোড়া রাষ্ট্রপতি-ভবনে থেকেও সারা ভারতবর্ষের প্রায় প্রতি প্রয়োজনীয় খবর রাখেন রাধাকৃষ্ণণ। ব্রিটেন-আমেরিকা ঘুরে আসার পর গেছি রাষ্ট্রপতি-ভবনে। ঠিক সময় এ-ডি-সি গিয়ে দরজা নক্ করতেই বেরিয়ে এলেন সর্বপল্লী। এ-ডি-সিটি নতুন। তাই জানাল, স্যার, ইউ আর সাপোজড টু রিসিভ এ ভিজিটার নাউ।

ফর্মালিটির বালাই নেই রাধাকৃষ্ণণের। বল্লেন, কাম অ্যালঙ্ নিমাই, চলো একটু বেড়িয়ে বেড়াই। মুঘল গার্ডেনে ঘুরতে ঘুরতে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর ? কলকাতার কি খবর ? গিয়েছিলে কলকাতা এর মধ্যে ?

জানালাম, কলকাতার খবর মানেই তো অসংখ্য সমস্যা ; আর বিশেষ কি বলুন ?

বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন ; বল্লেন, কেন, হোয়াট আব্যাউট আণ্ডার ইনভয়েসিং এ্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ মিনিস্টার্স উইথ বিগ বিজিনেশ ? কলকাতার কাগজ তো আজকাল এই খবরেই ভর্তি।

কাগজ-পত্তর বই পড়ার কোন জাত-বিচার নেই রাধাকৃষ্ণণের।

যা পান, তাই পড়েন। ফিলসফি, হিষ্ট্রী, পলিটিক্স, ইণ্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স থেকে শুরু করে মেডিকেল জার্ণাল, ফিল্ম ম্যাগাজিন, এম্বাসী বুলেটিন, চিঠিপত্র, পার্লামেণ্টারী ডিবেট, নানা রিপোর্ট ছাড়াও কয়েক ডজন স্বদেশী-বিদেশী সংবাদপত্র ইনি নিয়মিত পড়েন।

অতুলনীয় স্মৃতিশক্তি, দৃষ্টিশক্তিও প্রখর। কোনকিছু নজর এড়াবে না। একবার সর্বপল্লীর সঙ্গে নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে এলাম গৌহাটি। আসাম সঙ্গীত-নাটক আকাডেমীর কি যেন একটা উৎসবে গেলেন। যাকে বলে 'নেহেরু ক্রাউড' তাই হাজির হয়েছিল ওঁর বক্তৃতা শোনার জন্য। লক্ষ লোকের মধ্যে একপাশে বসে আছি আমি আর ভাইস-প্রেসিডেণ্টের একজন ব্যক্তিগত কর্মচারী। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে উপনিষদের একটা শ্লোকের রেফারেন্স দিতেই আমি ওঁর পি-একে বল্লাম, এই শ্লোকটার কথাই কাল রাত্রে আমাকে বলেছিলেন। ব্যস আর কিছু না। অনুষ্ঠান শেষে ফিরে এলাম সার্কিট হাউসে। বিছানার উপর পাগড়ি খুলে রেখেই ডাক দিলেন, 'কাম হিয়ার। আমি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলাম তখন কথা বলছিলে কেন? যখন অন্যে কথা বলে, তখন কথা না বলাই ভদ্রতা।'

অবাক হয়ে গেলাম। লক্ষ লোকের ভিড়ের মধ্যেও খেয়াল রাখলেন কি করে?

আর একবার লক্ষ্ণৌ গিয়েই বল্লেন, একটু বেরুতে হবে। 'শুনেছি, আমার এক ছাত্র বিশেষ অসুস্থ। তাঁকে দেখতে যাব।'

ছাত্রের নাম জানেন, কিন্তু বাড়ীর ঠিকানাটাও ঠিক মনে নেই। তবে বছর পঁচিশেক আগে একবার গিয়েছিলেন ঐ ছাত্রের বাড়ী। স্থানীয় কাউকে সঙ্গে না নিয়েই চল্লেন। এ-গলি সে-গলি ঘুরে ঠিক হাজির হয়েছিলেন অসুস্থ ছাত্রের বাড়ী।

গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রপতির সরাসরি কোন ক্ষমতা নেই, একথা সত্য। কিন্তু তবুও কলুষিত সমাজজীবনের মাঝে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ নিশ্চয়ই একটি আশার প্রদীপ।

চার

রাজপুত্রের রাজসিংহাসন ত্যাগের কাহিনী প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে সে কাহিনীর আর একবার পুনরাবৃত্তি ঘটল। তবে অতীতের রাজসিংহাসন ত্যাগের সঙ্গে আজকের মন্ত্রীত্বের গদীত্যাগের মধ্যে অনেক পার্থক্য। সেকালের রাজা-মহারাজের আধিপত্য কস্মিনকালেও আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের উপর বিস্তৃত ছিল না। অতীত ভারতে মোগল সম্রাট আকবর বা রাজর্ষি অশোকের অধীনে আজকের ভারতের অর্ধেকের বেশী ছিল না। আগের দিনের মত আজকের মন্ত্রীদের যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা নেই সত্য, কিন্তু ভারত সরকাবেব যে কোন মন্ত্রীর আধিপত্য অতীতের মোগল সম্রাটদের চাইতে অনেক বেশী। তাই হাসিমুখে স্বেচ্ছায় সেই সব মন্ত্রীত্বের গদী ত্যাগ করা কম শৌর্য-বীর্যের পরিচয় বহন করে না!

তাই তো বলি আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের আর একটি অধ্যায় শেষ হলো। সাউথ ব্লকে হোম মিনিস্ট্রি থেকে বিদায় নিলেন শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী। সবাই হয়ত জানেন না, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চাইতে বেশী ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি আজ আর ভারতবর্ষে হয় না। বিশ্বাস করুন, প্রত্যক্ষ ক্ষমতার দিক থেকে প্রধানমন্ত্রীর চাইতেও এঁর ক্ষমতা বেশী। রাষ্ট্রপতি চলেন হোম মিনিস্ট্রির পরামর্শে, ভারতের প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারক ও লাটসাহেবের দলও সরাসরি হোম মিনিস্ট্রির আওতায়। এ ছাড়া ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন, স্পেশাল পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ ছাড়াও ছোট-বড় প্রায় অর্ধশতাধিক সংস্থা ঐ সাউথ ব্লকের হোম মিনিস্ট্রির দ্বারাই পরিচালিত। ভারত সরকারের হোম মিনিস্টারই হলেন সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের প্রধানতম রাজনৈতিক পরামর্শদাতা। সমগ্র দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার গুরুদায়িত্ব এঁরই এবং এই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার

স্বার্থে প্রাদেশিক সরকারকে বাতিল করে সরাসরি সরকার পরিচালনার ক্ষমতাও একমাত্র হোম মিনিস্ট্রিরই আছে। সুতরাং একবার মুদ্রিত নয়নে চিন্তা করুন ভারত সরকারের হোম মিনিস্টারের ক্ষমতা। এ হেন ক্ষমতাসম্পন্ন হোম মিনিস্টারের গদী থেকে হাসিমুখে সরে দাঁড়ানো মনে হয় সহজ ব্যাপার নয়। ভগবান বুদ্ধদেবের দেশ ভারতবর্ষে আজ লালবাহাদুর ছাড়া বোধকরি আর কেউ নেই, যিনি এমন প্রশান্তচিত্তে হাসিমুখে এই 'সাম্রাজ্য' ত্যাগ করতে পারেন।

অজাতশত্রু লালবাহাদুর। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির বিদায় সম্বর্ধনা সভায় কমিউনিস্ট এম-পি গোবিন্দ নায়ার শাস্ত্রীজীর হাত দুটি চেপে ধরে বল্লেন, সবাইকে দুঃখ দিয়ে এভাবে মন্ত্রীত্বত্যাগের কি কোন অর্থ হয়? বিশ্ব-নিন্দুক সোস্যালিস্ট এম পি রাম-সেবক যাদব একটু কড়া মেজাজেই বলে ফেল্লেন, ম্যায় সাফ সাফ বাতা দেতা হুঁ, এ কাম আপ আচ্ছা নেই কিয়া। পি-এস-পির নাথ পাই ব্যারিস্টরী ইংরেজীতে বল্লেন, কুড ইউ টেল মি হু ওয়ান্টেড ইউ টু লীভ? পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের আর কোন সর্বাধিনায়ককে বিরোধীদলের সদস্যরা এভাবে বিদায় জানিয়েছেন বলে আজ পর্যন্ত দেখিনি বা শুনিনি। পার্সোনাল স্টাফের দল তো চোখের জলে বিদায় নিলেন! চোখের জল মুছতে মুছতে বৃদ্ধ জগন্নাথ সহায় বল্লেন, ভট্টচারিয়া, বিশ্বাস করো, 'বুড়ো বয়সে পিতৃবিয়োগ সহ্য করা যায় কিন্তু শাস্ত্রীজির মত মানুষের সংসর্গ ত্যাগ করার দুঃখ সহ্য করা যায় না। পার্সোনাল এ্যাসিসটেণ্ট ভেঙ্কটরমন বলছিলেন, বিলিভ মি, শাস্ত্রীজি ওয়াজ অভ গ্রেটার অ্যাট্রাক্‌সন টু মি দ্যান ইভন মাই হোম। তুমি তো দেখতে, দিনরাত ওঁর কাছে পড়ে থেকেছি আর কাজ করেছি, কিন্তু মুহূর্তের জন্য বিরক্ত বোধ করিনি, কারণ জানতাম উনি তো আমার চাইতে বেশী পরিশ্রম করেন।

সত্যি এমন মানুষ আজ খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।···তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে এ-আই-সি-সি হেড্ কোয়ার্টার্সে কংগ্রেস সেণ্ট্রাল ইলেকশন কমিটির মিটিংএ মনোনয়ন দেবার কাজ চলছে।

একটু হেসে জওহরলাল আমাদের এড়িয়ে গেলেন; অস্বাভাবিক ব্যস্ততার ভান করে দ্রুত পদক্ষেপে ইন্দিরার পাশ দিয়ে চলে গেলেন। ধীর পদক্ষেপে শাস্ত্রীজি বেরিয়ে আসতেই জোঁকের মত করস্‌পনডেন্টরা ঘিরে ধরলাম। দু'চারটে কথা বলে গাড়ীতে চাপলেন। আমি গাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করে হিন্দীতে কী যেন জিজ্ঞাসা করলাম; উত্তর দিয়ে বিদায় নিলেন শাস্ত্রীজি। গাড়ীটা সাত নম্বর জন্তর মন্তর থেকে বেরিয়ে যেতেই আনন্দ স্বরূপ আমাকে জানাল যে আমি নাকি এমন ধরনের হিন্দীতে শাস্ত্রীজির সঙ্গে কথা বলেছি, যা অব্যবহার্য! মনটা ভীষণ খারাপ লাগল। পরের দিন সকালে উঠেই গেছি এক নম্বর ইয়র্ক প্লেসে মাপ চাইতে। মুখ কাঁচুমাচু করে লনের এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এলেন শাস্ত্রীজি।

'কিযা হুয়া? তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?'

'দাদাজী, মাপ কর দেনা। কাল রাত্রে বোধহয় একটু অশ্লীল হিন্দীই ব্যবহার করেছিলাম···কিন্তু ইচ্ছা করে বলিনি।'

'বোকা কোথাকার! এর জন্য লজ্জিত হবার কি আছে? হিন্দী তো তোমার মাতৃভাষা নয়, সুতরাং ভুল হলে লজ্জার কি আছে? আমি তো জানি তুমি আমাকে অপমান করার জন্য কিছু বলনি··· আর তাছাড়া আমিও যে মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে দু' একটা বাংলা বলি, সেগুলোও কি সব ঠিক হয়?'

যাবার মুখে হাতে একটা কমলালেবু দিয়ে বল্লেন, খেতে খেতে আনন্দে বাড়ি যাও।

যে কাজের জন্য অন্য কেউ গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিতেন, তারই জন্য শাস্ত্রীজির এই ব্যবহার!

এক সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেও কাজের চাপে রক্ষা করতে পারলেন না শাস্ত্রীজি। সেদিন পার্লামেণ্ট চলেছিল রাত আটটা পর্যন্ত এবং তারপর রাত এগারটা পর্যন্ত এক ক্যাবিনেট সাব-কমিটির মিটিং। পরের দিন গিয়েছি শাস্ত্রীজির অফিসকক্ষে। সোজাসুজি উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত দুটি চেপে ধরে

বল্লেন, আই ওয়াণ্ট ইউ টু এ্যাপোলোজাইস্ মি!...আই উইল কম্পেনসেট ইউ লেটার। আমি তো হতবাক! প্রবাদ চালু আছে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কুকুরকেও 'আপনি' বলে সম্বোধন করে সম্মান দিতেন। বিদ্যাসাগরের এই কাহিনীর সত্যাসত্য বলার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু শাস্ত্রীজিকে দেখে বুঝেছি ভারতবর্ষে এমন লোক থাকা অসম্ভব নয়।

শীতকাল। ডিসেম্বর কি জানুয়ারী মনে নেই। সন্ধ্যার পর শাস্ত্রীজির বাড়ী গিয়ে দেখি গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে অথচ শাস্ত্রীজিকে কোথাও দেখছি না। খবর নিয়ে জানলাম, সারভেণ্টস কোয়ার্টারে গিয়েছেন। অফিস-ঘরের পাশ দিয়ে সিকিউরিটি স্টাফের তাঁবুর বাঁদিক দিয়ে হাজির হলাম সারভেণ্টস কোয়ার্টারে। দেখি চাকরটির শিশু-সন্তান ডবলনিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। শাস্ত্রীজি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ডাক্তার দেখাচ্ছেন। নিজের গাড়ী দিয়ে একজন পি-এ'কে পাঠিয়ে দিলেন ঔষধ আনতে। দিল্লীর প্রবল শীতে চাকরটির শিশু-সন্তান মেঝের ওপব সামান্য বিছানায় শুয়ে ছিল। শাস্ত্রীজি তৎক্ষণাৎ বলে দিলেন "কোঠিকা অন্দর সে চারপায়ি লে আও, আর আমার ঘর থেকে হিটারটা নিয়ে এসে এখানে জ্বালিয়ে রাখ।" ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করে নিজের স্ত্রীকে চাকরের ঘরে থাকতে বলে শাস্ত্রীজি গেলেন অফিস। অফিস গিয়েও কি স্থির থাকতে পারেন? ঘণ্টায় ঘণ্টায় টেলিফোন করে খবর নেন, টেম্পারেচার কমতি হুয়া? যে মানুষ রাত এগারটা পর্যন্ত অফিস করেন, তিনিই চাকরের শিশুসন্তানের অসুস্থতার জন্য বাড়ী এলেন কদিন সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ফাঁকি দিয়ে কোন মহৎ কাজ হয় না। শাস্ত্রীজিকে দেখে তাই ভাবি, মহত্ত্ব আর ঔদার্য না থাকলে কখনও এমন মানুষ হয় না।

পাঁচ

কমলা নেহরুকে আমি দেখিনি, তবে শুনেছি তাঁর চোখ দুটি নাকি চমৎকার ছিল। তাইতো "ইন্দু"র জন্মের পর সরোজিনী নাইডু তাঁর নাম রেখেছিলেন, "বেটি অফ দি বিউটিফুল আইজ"। কমলা-জওহরলাল-নন্দিনী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও তাঁর মা'র সুনাম রেখেছেন? চেহারা, হাব-ভাব ও স্বভাব-চরিত্রে ইন্দিরার উপর তাঁর মার প্রভাবই নাকি বেশী। কি কথায় যেন ঠিক মনে নেই, তবে নেহরু নিজেই একদিন বলেছিলেন, 'সী ইজ মোর অফ কমলাস, ছান অফ মাইন।' তাই বোধহয় ইন্দিরাও তাঁর মার মত দীর্ঘদিন হাসি-মুখে সংসার করতে পারলেন না। দেখেশুনে মনে হয় শুধু হাবভাব চালচলন, চেহারা, স্বভাব-চরিত্রে নয়, ইন্দিরার অদৃষ্টের উপরে কমলার প্রভাব রয়েছে যথেষ্ট। নেহরু-পরিবারের বধূরূপে এসেও সুখী হতে পারেননি কমলা। সতী-সীমন্তিনী হয়েও স্বামীসান্নিধ্যে বঞ্চিতা ছিলেন কমলা। জওহরলাল শুধু কমলার স্বামীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অসংখ্য মানুষের হৃদয়সম্রাট। তাই নেহরু শুধু কমলার ঘরে স্বামীরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন না; ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে তিনি আসন পেতেছিলেন। এর পর ছিল জওহরলালের পৌনঃপুনিক বন্দীদশা। জীবনের বহু পরম দিনে তিনি কমলার পাশে আসন নিতে পারেননি ইংরেজ সরকারের জেলখানার সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য। শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্যের জন্য জীবনের বহু আনন্দ থেকে বঞ্চিতা ছিলেন কমলা। নেহরু নাকি ভগবান বা অদৃষ্টে বিশ্বাসী নন; কিন্তু জীবনের সব কিছু পেয়েও কিছুই পেলেন না তাঁর পত্নী। এটা কি অদৃষ্ট নয়?

ইদানীংকালে ইন্দিরা গান্ধীকে দেখেও কেন জানি না বরাবরই তাঁর মার কথা আমার মনে আসে। জীবনে বহু কিছু পেয়েও ইন্দিরার মুখে আজ হাসি নাই কেন?

নানা কারণে ক'মাস আর দেখাশুনা হয়ে ওঠেনি। সেদিন তিন মুর্তির প্রাসাদে গিয়েছিলাম ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। ড্রইংরুমে ঢুকতেই

কেমন যেন শূন্য শূন্য লাগল। সিঁড়ির পাশে টেবিলের উপর পৃথিবীর অসংখ্য নেতৃবৃন্দের অটোগ্রাফ-করা ছবির যে গ্যালারী ছিল, সেটা আর নজরে পড়ল না। এই ছোট্ট অথচ অমূল্য গ্যালারীটি আমার বড় ভাল লাগত। হঠাৎ যেন চোখের সামনে মনের পর্দায় ইতিহাসের মিছিল দেখতে পেলাম। দু'এক মিনিটের মধ্যেই যিনি আমার সামনে হাজির হলেন, তাঁকে যেন আরো শূন্য মনে হলো। কাছে এসে দাঁড়াতেই হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

—"কিয়া হুয়া? অমন করে কী দেখছ।"

—"বিশেষ কিছু না; দেখছি আপনার পরিবর্তন।"

একটু মাথা নীচু করলেন; গলার স্বরেও যেন কেমন একটা বেদনার্ত মনের স্পর্শ পেলাম। বল্লেন, "ওসব বাদ দাও···জান আমি নিজেই আজকাল নিজেকে দেখি না।"

সত্য! নিজেকে দেখলে কখনও অমন হয় না। উইলিংডন নার্সিং হোম থেকে ফিরোজের নিস্প্রাণ দেহটা তিন মূর্তির প্রাইম মিনিস্টার্স হাউসে যখন আনা হলো দুটি ছেলেকে কোলে টেনে নিয়ে কাঁদতে দেখেছিলাম ইন্দিরা গান্ধীকে। তারপর প্রাইম মিনিস্টার্স হাউস থেকে ফিরোজের অন্তিম যাত্রার পূর্বে ইন্দিরা ফিরোজের নিজের হাতে লাগান কাশ্মীরী গোলাপ গাছের দুটি ফুল এনে দিয়েছিলেন স্বামীর চরণপ্রান্তে; জানিয়েছিলেন তাঁর অন্তিম শ্রদ্ধা। ক'ঘণ্টার ব্যাপার। কিন্তু এরই মধ্যে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণকন্যার লালিত্য হঠাৎ যেন কোথায় বিদায় নিয়েছিল!

বহুদিন পূর্বে জাস্টিস পি, বি, মুখার্জির কাছে শুনেছিলাম এক খুনীর আসামীকে ফাঁসির হুকুম দেবার পর একরাত্রে আসামীর বাবার কালো চুল ধবধবে সাদা হয়ে গিয়েছিল। ফিরোজের মৃত্যুর পর কোথা থেকে হঠাৎ যেন প্রৌঢ়ত্ব নেমে এসেছে ইন্দিরা গান্ধীর উপরেও। চেহারায় নিস্প্রাণতা, চোখে বিষণ্ণতা আজ কারুরই দৃষ্টি এড়ায় না। তবু নিশ্চিন্তে নিভৃতে আপন কর্তব্য করে চলেছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

তিনমূর্তি প্রধানমন্ত্রী ভবনে মানুষের আগমন-নির্গমনের শেষ নেই ; এদের মধ্যে কেউ যশস্বী, কেউ নিপীড়িত। তবু সমানভাবে সবার সমাদর করা এঁর বৈশিষ্ট্য। একদিন বিকেলের দিকে কি কারণে গিয়েছিলাম ওঁর কাছে। দেখলাম ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এক দম্পতিকে সঙ্গে নিয়ে ? মেয়েটির লাল চেলী দেখে বুঝতে দেরী হলো না এরা 'দুর্গম সংসাব পথে'ব সাম্প্রতিক যাত্রী। এক নজুবে দেখে নিলাম, ছেলের হাতে মিষ্টির প্যাকেট আর মেয়েটির হাতে কাগজের মোড়া আর একটি প্যাকেট। কিছু প্রেজেনটেশন নিশ্চয়ই। নবদম্পতিকে দেখে বুঝতে কষ্ট হয়নি, দারিদ্রের লাঞ্ছনাকে ভূষণ করে কোন দুঃস্থ পরিবারে এদের জন্ম। সস্নেহে বিদায় জানিয়ে এলেন শ্রীমতী গান্ধী। নবদম্পতির কথা জিজ্ঞেস করতে হেসে বল্লেন, 'এরা আমাব মেজজামাই। মেয়েটির টি-বি হয়েছিল, মা বলে হাজির হয়েছিল আমার কাছে।' তারপর আর কি ? জগদ্ধাত্রী মা প্রথমে তার চিকিৎসা তারপর বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সম্ভবত মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূব করাব আপ্রাণ চেষ্টা করেন ইনি। পূর্ব বাংলার যে রিফিউজি মেয়েটি এক পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তিনমূর্তি হাজির হয়ে নতুন জীবন ফিবে পেয়েছিল, তার কাহিনী তো প্রায় উপন্যাসের মত।

যান গরমের দিনে অপরাহ্ণ বেলায়। দেখবে- হাজার কাজের মধ্যেও টেলিফোন মেকানিককে এক গেলাস কোল্ড ড্রিঙ্ক দিতে ভুলছেন না শ্রীমতী গান্ধী। দিনের শেষে রাজমিস্ত্রীর দল বাড়ী ফিরে যাবার আগে এক কাপ চা দুটি বিস্কুট পাবেই। ঘটনাগুলি সামান্য কিন্তু হৃদয় ঔদার্যের পরিচয় বহন করে এরা !

নানা কারণে নিজের কনস্টিটুয়েন্সী ঠিকমত দেখাশুনা করা নেহরুর পক্ষে সম্ভব হয় না। সারা ভারতবর্ষেই তো তার কনস্টিটুয়েন্সী। তাই ফুলপুরের মানুষের দায়-দায়িত্ব এঁরই বহন করতে হয়। একবার দেখি একজন এসে আবেদন জানাচ্ছে, মাতাজী, ছেলেকে এনে দাও। কী ব্যাপার ? পরীক্ষায় ফেল করে ছেলে মারের ভয়ে ঘর

ছেড়ে পালিয়েছে আর ওদিকে তার জননী আমরণ অনশন শুরু করেছেন। কি আর করবেন, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মাতাজীকে ছেলে উদ্ধার করে দিতে হলো।

ইদানীংকালে শ্রীমতী গান্ধী কেমন যেন নিজেকে একটু গুটিয়ে রাখেন; ব্যস্ত রাখেন অনেক কাজের মধ্যে। কিন্তু তবুও সব ছাড়িয়েই তাঁর শূন্য মনের বিষণ্ণতা সবার চোখে ধরা পড়ে।

ছয়

জওহরলালের বাড়ীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল। মিটিং শেষ হবার পর অধিকাংশ করস্‌পনডেন্টই ছুটলেন আট নম্বর ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোড। কংগ্রেস জেনারেল সেক্রেটারীর ব্রিফিং। যাঁরা আরো একটু উৎসাহী, তাঁরা পরিচিত দু'একজন ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বারদের বাড়ী। কিন্তু শীতের শেষের সেই সন্ধ্যায় ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং শেষ ক'জন নেতা যে তিন নম্বর ইয়র্ক প্লেসে (অধুনা মতিলাল নেহরু প্লেস) ঢুকলেন, সে কথা বোধকরি অধিকাংশ সাংবাদিকই জানতেন না বা জানার তাগিদ বোধ করেননি। আমারও যে ঠিক মনে ছিল, তা নয়। অতুল্যদার বাড়ী থেকে সি-টি-ও ঘুরে বাড়ী ফেরার পথে নিতান্তই হঠাৎ মনে পড়ায় গাড়ী ঘোরালাম টি, টি, কে'র বাড়ী। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বেরিয়ে এলেন শাস্ত্রী-মোরারজী-টি· টি· কে। পিছনে পিছনে এলেন কৃষ্ণচন্দ্র—স্বর্গতঃ পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের ছেলে।

স্বর্গতঃ পন্থজীর স্মৃতিরক্ষার জন্য নেহরু, টি· টি. কে, শাস্ত্রী, মোরারজী প্রভৃতিকে নিয়ে একটা ছোট্ট কমিটি হলো এই মিটিং-এ। কে সি পন্থ হলেন স্মৃতিরক্ষা কমিটির সেক্রেটারি।

…টি টি কে'র বাড়ীর বারান্দায় বসে বসে অনেক কথাই মনে পড়ছিল। ভাবছিলাম, এই ত সেদিন পর্যন্ত এই বিরাট মানুষটি বেঁচেছিলেন; আর কত অগুন্তি মানুষই না আসত তাঁর কাছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আসতেন নানান রকমের পরামর্শ নিতে;

কিন্তু হাজার হাজার লোক আসত নিছক তাঁবেদারী করতে, শ্রদ্ধা জানাতে অথবা শুধু দেখতে। আজ তাঁরা সব কোথায়! পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান বা তাঁদের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের বিধি আছে আমাদের শাস্ত্রে। ভাটপাড়ার শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমি নই; পিতৃপুরুষ এই পিণ্ড খেতে আসেন কি না তা আমার জানা নেই। তবে মনে হয় এইসব ক্রিয়াকর্মের মূল উদ্দেশ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আধুনিককালে আমরা আধুনিক হবার পর পিতৃপুরুষকে পিণ্ড দান করাই শুধু বন্ধ করিনি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও ভুলে গেছি।

দিল্লীর নেতাদের সম্পর্কে বাংলাদেশে খুব সুন্দর মনোভাব নেই একথা সর্বজনবিদিত। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধাচরণই আপাততঃ এর প্রধাণ কারণ। রাজনীতির কথা বাদ দিন; রাজনীতিই তো আর সমগ্র জীবন নয়! দরদী মানুষ হিসেবে তাই পন্থজীর কথা ভোলার নয়…জানকীকে বলে বেলা সাড়ে পাঁচটায় এ্যাপয়েন্টমেন্ট হলো নভেম্বরের গোড়ার দিকে; দিনের বেলায় বিশেষ গরম জামা না পরেই বেরিয়েছিলাম। মতলব ছিল সন্ধ্যা লাগতে লাগতেই ফিরব। পন্থজীর বাড়ী গিয়ে দেখি ড্রইংরুম-ভর্তি লোক। লোক বললে ঠিক বলা হয় না; কারণ তাঁর বারো আনাই ভি-আই-পি। চোখের সামনে দেখলাম ইনি আসছেন, উনি যাচ্ছেন এবং এমনিভাবে আমার যখন ডাক পড়ল তখন ঘড়িতে দেখি ন'টা চল্লিশ। আপনারা নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন; কারণ সাড়ে পাঁচটায় এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তার প্রায় আড়াই শ' মিনিট পরে দেখা হলো। পন্থজীকে যাঁরা জানতেন তাঁরা কিন্তু আশ্চর্য হবেন না। (তখন উনি উত্তর প্রদেশের চীফ মিনিস্টার। কোন একটা বিশেষ কারণে লক্ষ্ণৌ স্টেশন থেকে তাঁর ব্রডকাস্ট করার কথা সন্ধ্যে ছটা নাগাদ। পন্থজী যখন হাজির হলেন তখন রাত্রি নটা। তারপর থেকে পন্থজীর সব বক্তৃতা আগে থেকে রেকর্ড করে রাখার নিয়ম হয়ে গেল।) যাই হোক পন্থজীরা ঘরে ঢুকতেই বল্লেন, কি, গরম জামা নেই কেন? আমি উত্তর দেবার আগেই ঘণ্টা

বাজিয়ে জানকীকে ডাক দিলেন। একটা গরম চাদর এনে দিতে বল্লেন। চাদর এলো ; কিন্তু চাদর নিতে আমি কুণ্ঠা প্রকাশ করলাম। তিনি সোজা জানিয়ে দিলেন, চাদর গায়ে না দিলে কথা বলবেন না। চাদর নিলাম, কথা হলো।

রায়পুর কংগ্রেস থেকে ফিরছি। আমারই কম্পার্টমেন্টে ছিলেন এক প্রাদেশিক সরকারের একজন পরিচিত মন্ত্রী। ইনি ইতিপূর্বে এক বিখ্যাত দেশীয় রাজ্যের প্রথম কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার চীফ মিনিস্টার ছিলেন। এই রাজ্যের নবাবের মৃত্যুর পর তাঁর গদী দখল নিয়ে দুই কন্যার মধ্যে লড়াই চলছিল। এঁর এক কন্যা ছিলেন এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ডিপ্লোমাটিক সার্ভিসে। এই নবাববাড়ীর চক্রান্তে ভারতের বহু সম্পদ দেশের বাইরে চলে গিয়েছিল বা যাচ্ছিল। বন্ধু মন্ত্রীর কাছে শুনলাম, পন্থজী কিভাবে তা রোধ করেছেন। দিল্লী ফিরে এক লম্বা-চওড়া রিপোর্ট টাইপ করে সোজা পন্থজীর বাড়ি হাজির। আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করতেই টাইপ-করা কাগজ কটি এগিয়ে দিয়ে বল্লাম ঃ কণ্ট্রাডিক্ট অর কনফার্ম। রিপোর্টটি পড়ে শুনে ছাপাতে মানা করলেন। আমার মনে হয় এই ব্যাপারটিতে পন্থজী তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সে কাহিনীই তিনি ছাপতে মানা করে দেশের লোকের কাছে নিজের এক মস্ত পরিচয় গোপন রাখলেন। বিনা কৃতিত্বেই খবরের কাগজের পাতায় নাম ছাপান আমাদের অধিকাংশ পলিটিশিয়ানদের চিরাচরিত নীতি ; কিন্তু পন্থজী ছিলেন এর একটি জ্বলন্ত ব্যতিক্রম।

বহুদিন পর পন্থজী এলেন ভবনগর কংগ্রেসে। ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ যাবার পথে আমার সঙ্গে দেখা। 'কিয়া সব ঠিক-ঠাক্ হ্যায়'—জিজ্ঞেস করলেন পন্থজী। কোথায় ঠিকঠাক, খেতেই পাচ্ছি না।

বিকেলবেলায় প্রেস-রুমে বসে কি যেন টাইপ করছি। পন্থজীর খাস চাপরাশী ছুটতে ছুটতে এসে বল্লো, 'সাহাব আপকো ঢুঁড়তা

হ্যায়'। দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখি লাঠি ভর দিয়ে গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে পন্থজী। 'তোমারা খানা গাড়ীকা অন্দর হ্যায়, খা লেও।' পন্থজী ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ চলে গেলেন ; আর আমি ভবনগরের মহারাজার 'রোলস রয়েসে' ঢুকে মহানন্দে খেতে বসলাম।

সাত

ছোটবেলায় আর কৈশোরে খবরের কাগজের পাতায় পাতায় স্বদেশী আন্দোলনের কথা পড়তাম। পড়তাম জওহরলাল, রাজাজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালনী, পন্থজী, জয়প্রকাশ, অশোক মেটা, রামমনোহর লোহিয়া ও আরো কতজনের কথা। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে শুনতাম নেতাজীর বক্তৃতা। নানাজনের মুখে মুখে শুনতাম বিলেতে বসে কৃষ্ণমেননের কীর্তিকলাপ। বিমলবাবু হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছে কতদিন মাসানীর 'আওয়ার ইণ্ডিয়া'র পড়া না পারার জন্য বকুনি খেয়েছি, তার হিসাব-নিকাশ নেই। জওহরলাল-জামাতা ফিরোজকে নিয়েই কি কম খোশগল্প করেছি এঁর কাছে! এমনি নানাভাবে দেশের নেতাদের সম্পর্কে একটা অদ্ভুত কৌতূহল দানা বেঁধে উঠেছিল মনের মধ্যে। মাঝে মাঝে এঁদের কথা ভেবে উত্তেজনাও বোধ করতাম।

দেশ স্বাধীন হলো। হোয়াইটওয়ে লেডল'র ধ্বজায় মাটিল ধরল। বাই য়্যাপয়েন্টমেন্ট টু দি হিজ রয়্যাল ম্যাজেষ্টির কদর চৈত্রদিনের ঝরা পাতার মত ঝরে গেল। ব্যানকিন উঠে খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মচঞ্চলতা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পেল। ভাইসরয় কাউন্সিলের 'অনারেবল মেম্বর'দের গলফ খেলার ছবির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি-ভবন আর লাটপ্রাসাদের সূত্রযজ্ঞের ছবি ছাপা শুরু হলো সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। লর্ড ক্লাইভের একদা বংশধরদের তীর্থস্থান ইউনাইটেড সার্ভিসেস্ ক্লাব উঠে গেল ; পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় গান্ধীচক্র, সুভাষদল, ঝান্সী ব্রিগেড গড়ে উঠল। বিদেশী দ্রব্যের ব্যবহার কমল ; নেতাজী বিড়ি, তেরঙ্গা শাড়ী, সন্দেশ, গান্ধীজির বিকৃত ছবিওয়ালা

রেশনব্যাগ সারা দেশ ছেয়ে ফেলল। গ্রাজুয়েটও কণ্ডাক্টর হলো; আর ভূতপূর্ব রাজনৈতিক বন্দীর বিড়ির দোকান গজিয়ে উঠল অলিগলির আশেপাশে যত্রতত্র।

দিল্লীর ক্যুইনস্ওয়েের নাম 'জনপথ' হলো। সাহেব গিয়ে কংগ্রেস এলো। উত্তপ্ত লোহার উপর হাতুড়ি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে, সাউথ ব্লকে জওহরলালের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেও তেমনি দিল্লীর সমাজ-জীবনের সীমিত গণ্ডী ভেঙে একাকার হয়ে গেল। গলফ-চেমসফোর্ড-জিমখানা ক্লাবত্রয়, সিসিল-ইম্পিরিয়াল প্রভৃতির 'বার' ও গুটিকতক কুঠীর মধ্যে অতীত দিল্লীর যে সামাজিক গণ্ডী বাঁধা ছিল, পার্লামেণ্ট শীর্ষে তেরঙ্গা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তা কিংসওয়ে ক্যাম্প—হরিজন কলোনী থেকে দক্ষিণে তিনমূর্তি পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল নিঃশব্দে আর ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্যদের কুঠীর অতিবিস্তৃত অঙ্গনে ঘাসের জাজিমে অ্যালুমিনিয়াম পেণ্টেড বেতের কুর্শীতে বসে আই-সি-এস তিলকাঙ্কিত ভাগ্যবানদের অপরাহ্ণকালীন মোসাহেবীর আসর বিদায় নিয়ে নতুন করে আরম্ভ হলো পার্লামেণ্টের সেণ্ট্রাল হলের কফির মজলিস।

পার্লামেণ্টের প্রেস গ্যালারী থেকে জওহরলাল-কৃপালনী-মাসানী-ডাঙ্গে-অশোক মেটা প্রভৃতির বাদানুবাদের সঙ্গে সঙ্গে সেণ্ট্রাল হলের আড্ডাখানার প্রতি আমার অসীম আকর্ষণ। বোধকরি সারা দেশের মধ্যে এটি একমাত্র স্থান যেখানে মন্ত্রীদের অহমিকার উগ্র প্রকাশ নেই, নেই দলাদলির ক্ষুদ্রতা। রাজনৈতিক দুনিয়ার কৈলাস-মানস সরোবর আর কি!

কেরালায় সেণ্ট্রাল ইণ্টারভেশন নিয়ে লোকসভার ভিতরে কমিউনিস্টদের তীব্র মন্তব্যে জর্জরিত করলেন 'দাদা' কৃপালনী। কৃপালনীর ঘাঁড়ে বন্দুক রেখে ফায়ার করে সাদা টুপিওয়ালার দল আনন্দে আটখান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। কেরালার টমাস ট্রেজারী বেঞ্চে বসে খুনীর মামলার দারোগার মত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অফুরন্ত অভিযোগ পেশ করলেন 'মিঃ স্পীকার, স্যারে'র বিবেচনার

জন্য। ডাঙ্গের সুতীব্র কটাক্ষ ভীমরুলের হুলের মত বিদ্ধ হলো বিপরীত দিকের সবার অন্তরে। ডাঙ্গের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে বিধান-ভ্রাতষ্পুত্রী রেণু চক্রবর্তী ও মন্ত্রী-কন্যা পার্বতী কৃষ্ণাণের সম্মিলিত কলধ্বনি কৃপালনী-মাসানী-ফ্রাঙ্ক এ্যান্থনীকে একটু চঞ্চল ও লোকসভার পরিবেশকে কিঞ্চিৎ নাটকীয় করে তুলল। এমনিভাবে সাটল-ককের মত অভিযোগ-অনুযোগ দেওয়া-নেওয়া হলো।

'হাউস থেকে সেণ্ট্রাল হলে ঢুকলেন প্রায় সবাই। প্রেস গ্যালারী থেকে বেরিয়ে ঘুরে সেণ্ট্রাল হলে ঢুকতেই দেখি একটা সিগারেট হাতে নিয়ে গোবেচারার মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন দাদা কৃপালনী। আমাকে দেখতেই বল্লেন, এই ম্যাচিস দিজিয়ে।

'সরি।'

'সরি' বেটা বদমাস প্রেসওয়ালা, সিগারেট নেই পিতা এহি বিলিভ করনা হোগা?'

একটু এগিয়ে যেতেই আদিভূমি তেলেঙ্গানার নাগি রেড্ডীকে পাকড়াও করে বল্লেন, দাও আগুন দাও। বিস্মিতভাবে নাগি রেড্ডীকে চেয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হ'য়ে দাদা বলে উঠলেন, সারা কেরালায় আগুন জ্বালালে, আর আমার সিগারেটে একটু আগুন দিতে পারছ না?

মুহূর্তের মধ্যে পাশে এলেন ফিরোজ গান্ধী। আচার্যকে লক্ষ্য করে বল্লেন, কিউ দাদা, কী ব্যাপার? 'ইন্টারভেন' করব নাকি? বুঝলেন আগুন নিয়ে খেলা চলছে। পরোপকারের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পকেট থেকে দেশলাই বের করে বললেন, নিন আমিই আগুন জ্বালাচ্ছি। ফোক্‌লা দাঁতের এক গাল হাসি আর ধোঁয়া ছেড়ে আচার্য বললেন, তা বাবা তুমি আগুন জ্বালাতে পার; কিন্তু বি কুইক ফিরোজ। সবাইকে হাসিয়ে আচার্য অন্যত্র গমন করলেন।

একপাশ দিয়ে ঘুরে সেণ্ট্রাল হলের নিউজ কর্ণারে টেলিপ্রিন্টারের শেষ খবরগুলো দেখতে চলেছি, এমন সময় একটু খোঁচা খেতেই পাশ ফিরে দেখি শ্রীমতী উমা নেহেরু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। হাত ধরে

টেনে নিয়ে এক কোণায় পাশে নিয়ে বসালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, বলতে পারো বাঙালীদের মধ্যে চৌধুরীরা ব্রাহ্মণ না কায়স্থ ? হিন্দুর' ধর্মশাস্ত্র ও লক্ষ্মণ সেন প্রচলিত শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আমার জ্ঞান অপরিসীম ; তবুও সমস্ত স্মৃতি রোমন্থন করে বিজ্ঞের মত জানালাম 'দুই-ই' হয়। শ্রীমতী নেহেরুকে একটু চিন্তান্বিত দেখলাম। জানলাম, তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায় যেসব বাঙালী উদ্বাস্তু মেয়েরা উত্তর-প্রদেশের নানা হোমে রয়েছেন, তাঁদেরই একজনের বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে এই খোঁজ। ইনি উত্তর-প্রদেশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে এক 'জেণ্টলম্যানস এগ্রিমেণ্ট' করেছেন যে এই সব বাঙালী উদ্বাস্তু মেয়েদের বিয়ের জন্য বেকার অথচ ভাল ছেলে তাঁর পছন্দ হলে সরকারকে তাদের চাকুরি দিতে হবে। শুধু তাই নয়, উত্তরপ্রদেশ সরকারের নানা দপ্তরে ফাইলের স্তূপের আড়ালে যে সব চিরকুমার লুকিয়ে বয়েছেন, তাদের বহুজনের খোঁজ করে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাবাব প্রাণান্তকব প্রচেষ্টা করেন ইনি।

কানে কানে ফিস ফিস করে বললেন, মেয়েদের 'হোম' চালান কি সহজ ব্যাপার ! ঝঞ্ঝাটের যেন শেষ নেই।···এক মহারাজপুত্র জানাল সে একটি রিফিউজি মেয়েকে ভালবাসে এবং বিয়ে করতে চায়। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলে মাথা নীচু করে নখ খুঁটতে লাগল ; বুঝলাম ইচ্ছা আছে। এবার একটু দৃঢ় হয়ে বললেন, জান ভট্টাচারিয়া, আমি কিন্তু ঐ বিয়েতে মত দিলাম না। রাজকুমারকে জানিয়ে দিলাম, বাপের টাকা ও চোখের নেশা কেটে গেলে তো আমার রিফিউজি মেয়েকে দূর করে দেবে ; তোমার সঙ্গে মেয়েব বিয়ে হবে না।

* * *

শ্রীমতী নেহেরু অন্য একদিন এখানে বসেই কথায় কথায় টাকা-কড়ির আলোচনা শুরু করলেন—লোকে ভাবে এম-পি বলে কত টাকাই না জমাই। বিলিভ মি, একটা পয়সাও জমে না। পার্লামেণ্টারী পার্টিকে হেভী সবস্ক্রিপসন ছাড়াও আজ এটা, কাল ওটা তো লেগেই আছে।···এই ত জওহরলাল বলেছে, আসাম আর কাশ্মীর

ফ্লাডের জন্য একান্ন টাকা করে দিতে হবে। নিজের কনষ্টিটুয়েন্সীতে খরচ আছে, মণ্ডল-জেলা-পি-সি-সি ও এ-আই-সি-সির চাঁদা তো আছেই। এ ছাড়া আছে সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানিজেশন ও আমাদের চিলড্রেন্স আর রিফিউজি হোম-এর চাঁদা। পার্লামেণ্ট থেকে যা পাই, তার একটা পয়সাও বাঁচে না, উপরন্তু কুলিয়ে ওঠাই দায়।' একটু থেমে আবার বলেন, জওহরলালকেও সব দিয়ে দিতে হয়; বই'এর আয় থেকে কোনমতে নিজের খরচা চালায়।

রিফিউজি মেয়েদের কাহিনী শুনে দিল্লীর পার্লামেণ্ট ভবন থেকে মন তখন চলে গিয়েছে কর্ণফুলি-বুড়ীগঙ্গা-মেঘনার পারে; স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছে ধুবুলিয়া-বার্ণপুর-বনগ্রামের সেই পরিচিত বেদনাময় ছবি। একটু আনমনা হয়েই চলেছিলাম। হঠাৎ তীব্র হাসির শব্দে মনের চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। দেখি পাতিল খুব জোর জমিয়ে বসেছেন। কেরালার কমিউনিস্ট ডেমোক্র্যাসী নিয়ে খোশগল্প চলছে। কেরালা শুনতেই খবর পাবার মহোৎসাহে বেশ একটু ঠেলাঠেলি করেই জায়গা করে নিলাম। শুনি পাতিল বলছেন, কেরালার এক মহতী জনসভায় গীতার কয়েকটা শ্লোককে অ্যামেণ্ড করে ডেমোক্রাটিক করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এযুগে গীতার 'এথিক্স অফ লাইফ' অচল এবং তাকে অ্যামেণ্ড করতে হবে। পাতিলেব বক্তব্য শেষ হলো, হাসিতে -বাই লুটিয়ে পড়লেন।

পার্লামেণ্টের কমিউনিস্ট পার্টিব চীপ এম-পি-রিলেসন্স অফিসার রেণু চক্রবর্তী এতক্ষণ ধৈর্য ধরে গল্প শুনে এবার পাতিলের পিঠে এক মৃদু চাপড় মেরে বললেন, হোয়াট ইজ দিস?

কাকুতি-মিনতি করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার জাঁদরেল মন্ত্রী পাতিল দু'হাত জোড় করে বললেন, রেণু, ফর গডস্ সেক, প্লিজ এক্সকিউজ মি। আই অ্যাম দি লাস্ট ম্যান টু ট্রাই ‸ অ্যামেণ্ড ইউ অ্যাণ্ড ইউর ফ্রেণ্ডস। যা বলেছি, সব অফ্ দি রেকর্ড, রাগ করো না।

হাজার হলেও বিধান ডাক্তারের ভাইঝি, সাংবাদিকের পত্নী এবং

তার উপর কমিউনিস্ট। সুতরাং বিক্রমটা নেহাৎ-ই কম নয়! ফোঁস ফোঁস করতে থাকেন চক্রবর্তী-গৃহিণী।

একটু চুপ করে থেকে এবার নিতান্ত গোবেচারার মত পাতিল বলেন, রেণু, কাম হিয়ার, বসো কফি খাও।...বেয়ারা! কফি লে আও ; এক, দো, তিন...দশ কাপ লে আও।

—শুধু কফি কে খাবে? ফোঁস করে উঠলেন শ্রীমতী চক্রবর্তী!

—আচ্ছা বাবা, অর ভি কুছ লে আও ; স্যাণ্ডউইচ, কাজু· ·।

সবাই এদিকেই মশগুল। এক পাশে ফিরোজ আর কৃষ্ণমেনন যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, বিশেষ কেউ লক্ষ্যই করেননি। মাথা থেকে গান্ধীটুপি খুলে সাদা চকচকে টাক চুলকাতে চুলকাতে পাতিলকে লক্ষ্য করে ফিরোজ বললেন, মিনিস্টার সাব! হু আর দি টেন ফরচুনেটস যারা কফি আর ঐ সব কি কি পাবে?

অভিমান-হত কণ্ঠে ভ্রূকুঞ্চিত করে কৃষ্ণমেনন বলেন, ফিরোজ, ডোণ্ট বেগ ফ্রম সেলফিস পাতিল। শুধু নিজেই কফি খেতে জানে।

উদাসীনভাবে পাতিল বললেন, ফিরোজ মে ট্রাই হিজ লাক, বাট আই ডোণ্ট সী এনি হোপ ফর অ্যানাদার।

তবে রে! নো হোপ অ্যানাদার! ছড়ি দিয়ে পাতিলকে ঠেলে সরিয়ে জায়গা করে নিলেন কৃষ্ণমেনন। বেয়ারা কফির ট্রে নিয়ে হাজির হতেই চিলের মত ছোঁ মেরে তুললেন। সবার বিস্ময় কাটবার আগেই এক কাপ শেষ করে আর এক কাপ ঢেলে নিলেন মেনন। মিনিটের কাঁটা ঘুরতে না ঘুরতেই সেকেণ্ড কাপ শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন।

গুড বাই রেণু। ছড়ি দিয়ে পাতিলকে এক খোঁচা মেরে বললেন, গুড বাই পাতিল। এক ড়'কদম সরে গিয়ে বললেন, আমার লুঙ্গি পাঞ্জাবির পকেট নেই, পয়সাও নেই, আগে আগে কেটে পড়ি, নয়ত বেয়ারাটা হয়ত কিছু ধরবে।...অফকোর্স পাতিলের কোট-প্যাণ্ট-জামার অনেকগুলো পকেট ; ফিরোজ, ডু ইউ থিঙ্ক দে আর এম্প্‌টি?

পিছন ফিরে হাসতে হাসতে কৃষ্ণমেনন চলে গেলেন।

—একমাঘে শীত যাবে না। এই বলে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করেন পাতিল।

একটু দূরে দেখি সোস্যালিস্ট থিওরিটিসিয়ান অশোক মেটা কয়েকজনের সঙ্গে কি না কি গুরুতর বিষয় আলোচনা করছেন। পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আরও দু' একজন বাঙালী ছিলেন। আমার দিকে লক্ষ্য করে বল্লেন, আই কাণ্ট ইমাজিন বেঙ্গল ক্যান গো কমিউনিস্ট। সব বাঙালীর মধ্যেই দেশপ্রেম আছে, ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা আছে···

মাঝখান থেকে কে একজন বলে উঠলেন, বাংলার কংগ্রেস যে—

তীব্র আক্ষেপ করে সোস্যালিস্ট তত্ত্ববিশারদ বলেন, তাই বলে সবাই কমিউনিস্ট হবে? একি কথা?

আলাপ-আলোচনার যেন শেষ নেই সেণ্ট্রাল হলে। কি মন্ত্রী, কি এম-পি, কি প্রেস করসপনডেণ্ট-সবার মুখে যেন তুবড়ী ফোটে এখানে।

গোটা দুই বেঞ্চি জুড়ে জমিয়ে বসেছিলেন দাদা কৃপালনী। দাদাকে ঘিরে ছিলেন মহাবীর ত্যাগী, মালব্য, বিমল ঘোষ, শরণ সিং, অশোক সেন প্রভৃতি এবং আমরা একদল। আলোচনা হচ্ছিল মৌলানার বম্ব শেল ফ্রম গ্রেভ ইয়ার্ড—ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম।

আচার্য বল্লেন, আগে তো ওয়ার্কিং কমিটির সব মিটিংয়েই আমি উপস্থিত থাকতাম। কিন্তু কই, মৌলানাসাহেব বইতে যা লিখেছেন, তাতো কোনদিন বলতে শুনিনি।

বিমল ঘোষ বলে উঠলেন, দাদা, আপনি একটা অটোবায়োগ্রাফী বা মেমরি অফ ফ্রীডম মুভমেণ্ট লিখুন···

মালব্য-ত্যাগী-অশোক সেন একযোগে বলে উঠলেন, হ্যাঁ দাদা, আপনি একটা লিখুন।

—কি হবে লিখে? পোস্টমর্টেম একজামিনেশন করে কি কোন লাভ আছে? তাছাড়া এতে হয়ত আবহাওয়া আরো অন্ধকার হয়ে উঠবে।

সবাই বলে উঠলেন তা হোক, তবু এর প্রয়োজনীয়তা আছে। ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েদের এসব জানান দরকার।

হঠাৎ মাঝখান থেকে বাঁকা চোখে আধো আধো সুরে সুচেতাদি বলে উঠলেন, আমি কতদিন বলেছি ওঁকে।

—তুমি তো কত কথাই বলো!

মহাবীর ত্যাগী বলে উঠলেন, দেশেরও কিছু হবে না, কংগ্রেসেরও কিছু হবে না। হবে কোথা থেকে? এদিকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের স্বামী ফিরোজ এক 'রিবেল,' আর জেনারেল সেক্রেটারীর স্বামী দাদা কৃপালনী আর এক ফেমাস 'রিবেল'। কংগ্রেস হ্যাজ বিন হাসব্যাণ্ডেড্ বাই রিবেলস।

লাভলি, লাভলি।

একটু মৃদু হেসে আচার্য বল্লেন, ওসব কথা আমাকে বলো না ভায়া; তোমাদের জওহরলালের পিসফুল কো-একজিসটেন্স বলতে যদি কোথাও কিছু থাকে, তবে তা আমার বাড়ীতেই আছে। সারা দুনিয়ার অন্যত্র তা বানচাল হয়ে গেছে।

আর একদিন নানাপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার পর হিউমার নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ডঃ কেশকার বল্লেন, আমি যতদূর জানি সরোজিনী নাইডুকে কেউ বিট করতে পারত না। মিসেস নাইডুর হিউমার জ্ঞানের এক চমৎকার কাহিনী শোনালেন ডঃ কেশকার।

মিসেস নাইডু তখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট। বোম্বে থেকে দিল্লী আসছিলেন; সঙ্গিনী ছিলেন এক প্রথিতযশা কংগ্রেসনেত্রী। নেত্রী মহোদয়ার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পুরুষকণ্ঠের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাছাড়া ববড হেয়ার ও দেহের গঠনে নারীর বৈশিষ্ট্য ও কমনীয়তার অভাব ছিল। যাহোক, এক লেডিস ফার্স্ট ক্লাশে এঁরা দুজনে ভ্রমণ করছিলেন। বেশ একটু রাতে হঠাৎ কি কারণে টিকেট-চেকার দরজায় নক্ করল। দরজা খুলে স্লিপিং স্যুট্ পরিহিতা মিসেস নাইডু-সঙ্গিনী চেকারের সামনে হাজির হলেন।

—হোয়াটস দি ম্যাটার? এত রাত্রে বিরক্ত করতে এলেন কেন?

কণ্ঠস্বরের সেই কর্কশতা।

চেকার তো রেগে লাল। বিরক্ত করতে এলাম কেন, সে পরে দেখা যাবে। কিন্তু হাউ কুড ইউ বি ইন দিস লেডিস কম্পার্টমেণ্ট… কোনো লেডিস প্যাসেঞ্জার আছেন এই কম্পার্টমেণ্টে ?

—হ্যাঁ, আমি বাদে একজন লেডিস প্যাসেঞ্জার আছেন।

দুজনের কি তর্ক! শ্রীমতী নাইডু চাদর মুড়ি দিয়ে চুপচাপ মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন। তাঁর সঙ্গিনী নানাভাবে চেকারকে বোঝাতে চাইছিলেন যে তিনিও এই কামরায় ভ্রমণ করতে পারেন; কিন্তু চেকার কিছুতেই বুঝতে চাইছিলেন না।

দিল্লী ফিরে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে সব বৃত্তান্ত পেশ করলেন শ্রীমতী নাইডু। শেষে মন্তব্য করলেন, আই ডোণ্ট নো হাউ সী কনভিন্সড দি চেকার ছাট সী ওয়াজ কোয়ালিফায়েড টু ট্রাভেল ইন লেডিস কম্পার্টমেণ্ট।

এই সেণ্ট্রাল হলের এমন রাজনৈতিক ও অন্যান্য আলোচনার আড়ালে কাঁচা বয়সের একদল এম-পি আর করসপনডেট সরস আলোচনার আসর জমিয়ে বসেন।

ভারতনাট্যম দেখিয়ে লণ্ডন-প্যারী-মস্কোতে ঝড় বইয়ে, 'লণ্ডন টাইমস'এর এডিটোরিয়ালে কমেণ্টটেড হয়ে বৈজয়ন্তীমালা এলেন দিল্লী। অশোকা হোটেলে এক প্রেস কনফারেন্স নৃত্য-পটিয়সী অভিনেত্রী জানালেন, ভারত থেকে ভারতনাট্যম, কথক প্রভৃতি নৃত্য-শিল্পকে কন্টিনেণ্টে এক্সপোর্ট করার মহত্তম সুযোগ দেখে এসেছেন তিনি!

যোগীপুরুষের মত এক সাংবাদিক তাঁকে সিরিয়াসলি প্রশ্ন করলেন, বিয়ে করছেন কবে? পছন্দ করেছেন কাউকে। প্রশ্নকর্তার চাইতেও নির্বিকার চিত্তে নিতান্ত দার্শনিকের মত উত্তর দিলেন নর্তকী-অভিনেত্রী, ভেবে দেখিনি।

পরের দিন সেণ্ট্রাল হলে একদল ছোকরা এম-পি ও একদল করসপনডেণ্টদের সে কি সরস আলোচনা। আড় চোখে চেয়ে দেখেছি,

ক'জন বেশ বয়স্ক মিনিস্টার-এম-পি একটু দূরে বসে এই আলোচনার রসালাপ উপভোগ করছিলেন।

এমনিভাবেই চলে সেণ্ট্রাল হলের দিন। মাঝে মাঝে মনে হয়, বোধকরি সেনট্রাল হলই ভারতবর্ষের পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রাসীর মানস সরোবর!

আট

বিত্তাসাগরের প্রথম ভাগ পড়ার আগে থেকেই শুনে আসছি, চুরি করা মহাপাপ। বিশ্বসংসারে এমন একজনের দৃষ্টান্ত দেখান মুস্কিল যিনি বলেছেন, হ্যাঁ চুরি কর। ছোটবেলায় জ্ঞান হবার পর থেকে ঠাকুর্দা-ঠাকুমা, বাপ-মা, দাদা-দিদি, শিক্ষক-অধ্যাপক সবাই শিখিয়েছেন, চুরি করো না। ক্ষুধাতুর বুভুক্ষু সন্তানের মুখে এক গ্রাস অন্ন তুলে দেবার জন্য বাপ-মা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে আদালতে করুণ কাহিনী শুনিয়েছেন; জজসাহেবের চোখ ভেজা ভেজা হয়ে উঠেছে, কিন্তু নিদেনপক্ষে 'টিল দি কোর্ট রাইজ' পর্যন্ত তাদের কারাবাস করতেই হয়েছে। খবরের কাগজের পাতায় এসব কাহিনী ফলাও করে ছাপা হয়; তবু পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অগ্রাহ্য করে আমরা বলব, চুরি করা মহাপাপ।

সেসব যাই হোক, চুরি কিন্তু আমরা সবাই করি। শৈশবে আচার-আমসত্ত্ব চুরি, কৈশোরে পেয়ারা চুরি, পূজোর দিনে ফুল চুরি, বড় হয়ে অফিসে চুরি, জ্ঞাতিকে ফাঁকি দিয়ে সম্পত্তি চুরি, জাতিকে ফাঁকি দিয়ে নেতাদের চুরি চিরন্তন সত্য।

শুধু কি তাই! মেহনতী জনতার কাস্তে-হাতুড়ির তিলকপরা নেতার নিঃস্ব উদ্বাস্তুদের 'লোন' চুরি, মন্দির-মসজিদ-গির্জার চুরি, বৌ-চুরি, ছেলে-চুরি, রাশিয়ার হয়ে বৃটেন-আমেরিকার গোপন-সংবাদ চুরি, পশ্চিমের পক্ষে রাশিয়ার এ্যাটম সিক্রেট চুরি, পাকিস্তানী ছ্যাঁচড়াদের ভারতীয় সীমান্ত থেকে গরু-বাছুর আলু-পেঁয়াজ চুরি, ইলেকশনে ভোট চুরি, ট্রেনের পাখা চুরি, হাজার বছরের বুদ্ধমূর্তি

চুরি, কোনারকের মিথুন মূর্তি চুরি, লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক যাবার পথে প্লেনে পিকাসোর অমূল্য ছবি চুরি, বন্ধু-বান্ধবের 'লাভ লেটার' চুরি, হিন্দী ফিল্মী গানের জন্য রবীন্দ্রনাথের সুর চুরি, বাংলা সিনেমার জন্য বিদেশী গল্প চুরি, মিস কিলারের মন-চুরি ছাড়াও হাজার ধরনের চুরি প্রতিনিয়ত এই দুনিয়ায় চলছে। প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষভাবে কিছু না কিছু চুরি প্রত্যেকেই করেন। জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ আমরা; তাই চুরির মত হীন কাজ করি, একথা স্বীকার করতে আভিজাত্যে বাধে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, যত মত তত পথ। তাই সেই ভরসায় বলছি, আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, যিনি বলেন চুরি করেন না বা করেননি, তিনি মিথ্যাবাদী। নেহেরুর দেশে বাস করে আমি নিশ্চয়ই ডেমোক্রাট; তাই স্বীকার করি, এ সম্পর্কেও দ্বিমত থাকতে পারে।

*   *   *

রাষ্ট্রে ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের জন্য মন্ত্রীর দল নিয়মিত রাষ্ট্রপতি সন্দর্শনে যান। সচরাচর রাষ্ট্রের গুরুতর বিষয় নিয়েই এঁদের আলোচনা হয়। কিন্তু বিধাতাপুরুষের এমনই রসিকতা যে, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদকে একবার চুরুট নিয়েও আলোচনা করতে হয়েছিল জন কয়েক মন্ত্রীর সঙ্গে।

কিছুকাল ধরেই ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ খেয়াল করছিলেন রাষ্ট্রপতি ভবনের লাঞ্চ-ডিনার-ব্যাংকোয়িটে মিনিস্টার, ডেপুটি-মিনিস্টারদের চুরুট খেতে না দেখলেও চুরুটের বাক্স খালি হয়ে যায়। তাজ্জব ব্যাপার! চার্চিলের স্মৃতি-বিজড়িত হাভানা-বার্মার চুরুটের ভর্তি বাক্সটি রাখা হলো টেবিলে; কেউ খেলেন না অথচ বাক্সটি খালি হয়ে গেল নিয়মিত। সর্বজনপূজ্য মন্ত্রীপ্রবরদেব সামনে চুরুটের বাক্সে হাত দিতে বেয়ারা-চাপরাশী বা অন্য কর্মচারীদের সাহস হবে না, একথা রাজেন্দ্রপ্রসাদ জানতেন। তবে কি কোন 'মোহনে'র আবির্ভাব হলো মন্ত্রীদের মধ্যে?

খুব বেশী না হলেও রাজেন্দ্রপ্রসাদ একটু চিন্তিত হয়েছিলেন

বৈকি ! একদিন নিরিবিলিতে ধরলেন এক মিনিস্টারকে। জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তো বাপু কি ব্যাপার ?

কাকুতি-মিনতি করে মিনিস্টার বললেন, আজ্ঞে সার ওটি জিজ্ঞেস্ করবেন না। আমার পক্ষে একটু ডিফিকাল্ট······মানে আর কিছু না······মানে আর কি······

আগার মাগার লেকিন করে মিনিস্টারসাহেব এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু রাজেন্দ্রপ্রসাদের মনে আরো সন্দেহ জাগিয়ে গেলেন। শুনেছি পরে নাকি আরো দু'চারজন মিনিস্টার ডেপুটি-মিনিস্টারের কাছে খোঁজ-খবর করেছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। কিন্তু সবাই হাত কচলে মুখ কাঁচুমাচু করে উত্তর এড়িয়ে গিয়েছিলেন বলে শুনেছি। যেকালে কলকাতা ইউনিভার্সিটির খ্যাতি সারা বিশ্বের মনীষী-মহলে সবজন-বিদিত ছিল সেকালের কলকাতার 'নেভার স্টুড সেকেণ্ড' ছাত্র ছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। আমাদের অধিকাংশ মন্ত্রীদের চাইতে তিনি বোধকরি কম বুদ্ধিমান ছিলেন না। তাই নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিলেন, চুরুট-অন্তর্ধানের রহস্য উদ্ধারের জন্য তাঁর আর আগ্রহ দেখাবার কোন কারণ নেই।

*　　　　*　　　　*

ইংরেজ তাড়িয়ে আমরা যতটা সাহেবীপনা দেখাই, ইংরেজ আমলে এর এক আনাও ছিল না। ফিরিঙ্গী পোশাক, ইংরেজি খানা ও স্কচ হুইস্কী তাই স্বাধীন ভারতে কুলীনত্বের নিদর্শন। ইউরোপযাত্রীদের সবাই জানেন, প্যারিস থেকে ফাইভ ফিফটি ফাইভ সেণ্ট আনার কি তাগিদ। ঠিক এই একই কারণে লর্ড মাউন্ট-ব্যাটনের বিদায়ের পরও রাষ্ট্রপতি-ভবনে বিদেশী দ্রব্যের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে না কমে তার কদর আরও বেড়ে গেল। তবে হ্যাঁ, বিদেশী সিগারেটের ললাটে স্বাদেশিকতার তিলক পরিয়েই অতিথি আপ্যায়ন করা হতো। চুরুটের বেলায় এই সস্তা ন্যাশনালিস্‌ম দেখান হতো না ; একেবারে অরিজিনাল সীল সমেত পরিবেশন করা হতো।

দাদা আমাদের চুরুট খেতেন। চিন্তাবিদ ডেপুটি মিনিস্টার ছিলেন কিনা, তাই। লুঙিপরা বার্মীজ মেয়েদের হাতের তৈরী চুরুট না খেলে দাদার বুদ্ধি খুলত না, একথা সবাই জানেন। কনট প্লেসে কিছু কিছু ইমপোর্টেড স্টাফ পাওয়া গেলেও সব ভ্যারাইটি পেতেন না। কলকাতা গেলে নিউ মার্কেটে পেতেন, তবে চুরুটের মত দামও কড়া ছিল। তাইতে রাষ্ট্রপতি-ভবনে চুরুটের প্রতি দাদার সতৃষ্ণ দৃষ্টি গোড়া থেকেই ছিল। রাষ্ট্রপতি-ভবনের ইনভিটেশন এলে দাদার ফুর্তি দেখে কে? তবে শান্তিতে চুরুট খাবেন, তারও কি উপায় ছিল দাদার? নেহেরু-রাজেন্দ্রপ্রসাদের সামনে চুরুটের বাক্সে হাত দেওয়া অসম্ভব। তাইতো হাতছানির ব্যবস্থা!

নর্থ ব্লক পার্লামেন্টের করিডরেই দাদা কানে কানে ফিস ফিস করে বলে দিতেন, একটা কিন্তু ম্যানেজ করতেই হবে। দরকার মত টেলিফোনে বা রাষ্ট্রপতি-ভবনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বন্ধুদের মনে করিয়ে দিতে ভুলতেন না দাদা আমার। গোড়ার দিকে একবার ভাল করে পলিসি বুঝিয়ে দেবার পর শেষে আর বিশেষ কিছু বলতে হতো না। শুধু বলতেন, প্লিজ ডোণ্ট ফরগেট।

রাষ্ট্রপতি-ভবনে চুরুট খেলেন না কেউ, অথচ বাক্স খালি হয়ে গেল। তারপর সে চুরুট বন্ধুদল পৌঁছে দিতেন দাদার বাড়ী বা অফিসে। কেউ কেউ আগ্রহের আতিশয্যে রাষ্ট্রপতি-ভবন থেকে বাড়ী ফিরেই খামে মুড়ে ড্রাইভারকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন; হয়ত বা কখনও কখনও কেউ খামের উপর রসিকতা করে লিখে দিতেন, 'লাভিং প্রেজেণ্টস ফ্রম ডক্টর .....।'

তাইতো বলি প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে হোক, সুখেই হোক বা দুঃখেই হোক, ইয়ে বোধকরি সবাই করে। তাই নয় কি?

নয়

'মিনিস্টার সাব কাহা' জিজ্ঞাসা করেই সোজা ভিতরে চলে গেলাম অন্যদিনের মত। জানি, সকালে দুটি আদুরে আলসেশিয়ান

ছাড়া মন্ত্রীসান্নিধ্য উপভোগ করার অধিকার বাইরের বিশেষ কারুর নেই ; সুতরাং বিনা দ্বিধায় চল্লাম অন্দরমহলের দিকে। নারী-ভূমিকা বর্জিত গৃহজীবন যাপন করেন ইনি। আগন্তুক দেখে কোন অষ্টাদশীর, সলজ্জ পদসঞ্চারণ বা মাইশোর সিল্কের শাড়ীর আঁচল দিয়ে অঙ্গ আবরণের ত্বরিত প্রচেষ্টা দেখা যায় না এ গৃহে। তাই আমার ও-জি-এল, ওপন জেনারেল লাইসেন্স।

সিগরেটে শেষ সুখটান দিয়ে স্মার্টলি গেলাম ভিতরে। বারান্দা ড্রইংরুম পেরিয়ে হাজির হলাম সাহেবের খাস কামরায়। কপালে রক্তচন্দনের বিরাট তিলক আর অঙ্গে দরদ জড়িয়ে মন্ত্রীকে দেখলাম কৃষ্ণকায় এক ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় নিরত। ঘরের দরজায় আমাকে দেখে কুকুর দুটো এগিয়ে এসে গন্ধ শুকতে আরম্ভ করতেই মন্ত্রীর দৃষ্টি পড়ল আমার দিকে। কেমন যেন চমকে উঠলেন। আমিও যেন একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম, সামলে নিয়ে বল্লাম, নমস্তে।

'তা হা নমস্তে। কিয়া বাত হ্যায় ?'

কী আর করবেন. এসে যখন পড়েছি, ডাক দিলেন। বসলাম পাশে। পরিচয় করিয়ে দিলেন আগন্তুকের সঙ্গে। 'পণ্ডিতজী, হি ইজ ওয়ান অফ মাই প্রেস-ফ্রেণ্ডস ; আর ইনি হচ্ছেন পণ্ডিত কৃষ্ণমূর্তি। শঙ্করাচার্যের দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত ও জ্যোতিষী।'

নমস্কার বিনিময় করলাম। সামনের টেবিলে একগাদা কাগজে নানা ধরনের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ দেখে বুঝলাম জ্যোতিষ-চর্চা চলছিল। পণ্ডিতজীর আগমনের খবর বাইরের কাউকে না জানাতে অনুরোধ করলেন মিনিস্টারসাহেব। তবে কম্পেনসেশন হিসেবে পণ্ডিতজীকে বল্লেন, 'দেখুন না পণ্ডিতজী, এই হতভাগার অদৃষ্টে কি আছে।'

'নো হারি' বলে তখনকার মত পণ্ডিতজীকে এড়িয়ে গেলাম। কিন্তু পণ্ডিতজী হাতে একটা ভিজিটিং কার্ড গুঁজে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন তাঁর কাছে যেতে। আমার মতি-গতি দেখে বোধহয় মন্ত্রীর সন্দেহ দেখা দিয়েছিল ; তাই বল্লেন, ব্লাফ দিও না কিন্তু, বিপদে পড়বে।

মন্ত্রীগৃহ ত্যাগ করবার সময় পণ্ডিতজীর কার্ডটা দেখলাম; তাঁর সাময়িক আবাসস্থান হচ্ছে হোটেল ইম্পিরিয়াল, রুম নম্বর থ্রি সেভেন ফাইভ। বুঝলাম, এয়ার কণ্ডিসনড্ স্যুট। তাহলে একেবারে ভাটপাড়া বা গ্রে ষ্ট্রীটের জনতা এক্সপ্রেস মার্কা নয়।

নিজের উপর আস্থা হারিয়ে শনিমঙ্গলের মোসাহেবি, বৃহস্পতি-শুক্রের তাঁবেদারি বা মাদুলি-কবচের গহনা পরে জীবনের প্রতিষ্ঠা পাবার স্বপ্ন দেখিনি কোনদিন। কিন্তু তবুও গেলাম হোটেল ইম্পিরিয়াল—রুম থ্রি সেভেন ফাইভ-এ পণ্ডিতজীর সম্মোহনী বিদ্যা জানা আছে কিনা জানি না; তবে প্রথম সাক্ষাৎকার থেকেই ভক্ত বা শিষ্য না হয়েও পণ্ডিতজীর ইনার-ক্যাবিনেটের মেম্বার হয়ে গেলাম আমি।

উনিশ শ' বত্রিশ আর ছত্রিশের পর উনিশ শ' চল্লিশে আমেরিকার প্রেসিডেনসিয়াল ইলেকশনে রুজভেল্টের সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। এমন কি ডেমোক্রাটরাও বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। পণ্ডিত কৃষ্ণমূর্তি তখন লণ্ডনে। হিসাব-নিকাশ করে রুজভেল্টকে জানিয়ে দিলেন, জয়লাভ সুনিশ্চিত। তৃতীয় দফায় আবার চার বছরের জন্য হোয়াইট হাউসে বহাল হবার পর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট স্বয়ং পণ্ডিত কৃষ্ণমূর্তির জ্যোতিষ-বিদ্যার তারিফ করে চিঠি দিয়েছিলেন। চার্চিলের কাছে সুবিধে হয়নি, তবে ক্লিমেণ্ট এটলীকে কাত করেছিলেন পণ্ডিতজী। ভারতবর্ষের খ্যাত-অখ্যাত রাজরানীরা প্রায় সবাই লিখেছেন, ভূ-ভারতে এমন পণ্ডিত আর দেখিনি। ইদানিংকালে মিনিস্টার, এম-পি ও অনারেবল জাস্টিসদের যে কত প্রশংসাপত্র আছে, তা নাকি গুণে ওঠাও পণ্ডিতজীর সম্ভব নয়। প্রাণ খুলে পণ্ডিতজী আমাকে এসব বলেছিলেন; ছেঁড়া-ফাটা সার্টিফিকেটও দেখিয়েছিলেন এক গাদা।

তারপর থেকে পণ্ডিতজী দিল্লী এলেই স্মরণ করেছেন আমাকে। অবিশ্বাস্য আধিপত্য দেখেছি সর্বোচ্চ মহলে। ইলেকশনের আগে তো

স্নানাহারের সময় জোটে না পণ্ডিতজীর। ক্যাবিনেট রিস্যাফলের খবর কাগজে বেরুলে হলো! এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম রওনা হবে ত্রিবান্দ্রাম, এয়ারড্যাস টু দেলহি; কেউবা লিখবেন, ইমিডিয়েট কনস্যালটেশন নিডেড, কাম সার্প। আবার কোন অতি-আগ্রহী জানান, ডিজায়ার পারফর্মিং স্পেশ্যাল পূজা ফর স্যাটার্ন স্টপ ফিক্স ডেট স্টপ কাম এ্যাকর্ডিংলি···।

সুপ্রীম কোর্টের মামলায় যেমন এন, সি, চ্যাটার্জী বা শীতলবার্দকে এ্যাড্‌ভোকেট হিসেবে না পেলে মনে স্বস্তি পাওয়া যায় না, দিল্লীর বহু কর্তাও তেমনি জীবনের সন্ধিক্ষণে বা সঙ্কটকালে পণ্ডিতজীর হাতে যজ্ঞেব ছাই এর তিলক না পরে শান্তি পান না। প্রথম প্রথম বিশ্বাস করতাম না, ভাবতাম ফোর টোয়ন্টি। কিন্তু যাগ-যজ্ঞের প্রসাদ খাবাব পব আব অবিশ্বাস করতে পারিনি।

এই ত কিছুদিন আগেও হঠাৎ পণ্ডিতজী হাজির। কি ব্যাপার? শুনলাম, এক জাঁদবেল অফিসারের পত্নীর আবেদনে এসেছেন দিল্লী। গোটা তিনেক এক্সটেনশন শেষে মাস তিনেকের মধ্যেই রিটায়ার করছেন ভদ্রলোক। তদ্বির-তদারক করছেন কি একটা কমিশনের সেক্রেটারী হবার জন্য; কিন্তু চান্স কম। বাংলো বাড়ী, ফ্রি টেলিফোন ও একগাদা চাপরাশী-বেয়াবা না থাকলে যে বজ্রাঘাত হবে, সে দুশ্চিন্তায় অফিসারপত্নীর সজল-কালো নয়নেও আজ বিদ্যুৎ খেলে না। পণ্ডিতজীর তলব এই কারণেই। শুনলাম পূজা-অর্চনা যাগযজ্ঞ শেষে পণ্ডিতজী কিঞ্চিৎ আপেল-আঙুর-কিস্‌মিস্ আখরোট ও মিষ্টান্ন সেবনে বসেছেন, পাশে করজোড়ে স্বামী-স্ত্রী, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ভদ্রলোক রিসিভার তুললেন, হ্যালো···। কোনমতে কথা বলে টেলিফোন রেখে ছুটে এসে একেবারে পণ্ডিতজীর দেহি পদবল্লভ মুদারাম। 'আমার এক কোলিগ, একজন জয়েন্ট সেক্রেটারী, এক্ষুণি টেলিফোন করে বল্লো, মিনিস্টার আমার এ্যাপয়েন্টমেন্ট এ্যাপ্রুভ করেছেন।···পণ্ডিতজী, সবই আপনার দয়া।' গলায় আঁচল দিয়ে পণ্ডিতজীর শ্রীচরণ জড়িয়ে ধরলেন ভদ্রমহিলা।

সোনা-দানা কাপড়-চোপড় ছাড়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ছাপা কাগজের এক বড় বাণ্ডিল নিয়ে পণ্ডিতজী ফিরে এলেন হোটেলে।

পণ্ডিতজীর ঘরে বসে কত কাণ্ডই না দেখি! একদিন একজন এসে বললো, এম-পি সাহেবের কাজটা হয়ে গেছে?—'ও ইয়েস' বলে পণ্ডিতজী একটা খাম দিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক চলে গেলে পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? মনে হচ্ছে টপ সিক্রেট।

'ঠিকই ধরেছ। এঁরা রাইটিস্ট। জানতে চায়, মেনন আবার উঠবে কিনা। কারণ তাই বুঝে তো এঁরা চলবেন।'

'তা কি দেখলেন?'

'দেখ, স্টার্স আর সাচ দ্যাট যেমন কাণ্ট কাম আপ নাউ। হি উইল হ্যাভ টু লাই লো ফর ফিউ ইয়ার্স বাট হি উইল কাম আপ এগেন।'

পণ্ডিতজীর সঙ্গে যতই মিশি, ততই মজা পাই। দেখেশুনে মনে হয়, শুধু চাকরি-বাকরি রাজনীতির ক্ষেত্র নয়, জ্যোতিষের ক্ষেত্রেও সাউথ ইণ্ডিয়ানরা দিল্লীতে বেশ আধিপত্য জমিয়েছে। আর 'চলো চলো দিল্লী চলো' বলে চীৎকার করে, আকাশ-বাতাস নিনাদিত করেও বাঙালী দিল্লী তো দূরের কথা দুর্গাপুরেও নাকি আসতে চায় না! শুনেছি, ইতিহাসের গতিরোধ করা যায় না; আমরা বোধহয় সেই ইতিহাসের গতিতেই ভেসে চলেছি। তাই নয় কি?

দশ

পরনিন্দা না হলেও, পরচর্চা করে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু তবু কাহিনীর শেষ নেই। এককালে দিল্লীর রঙ্গমঞ্চে বাদশা-বেগমেরা অভিনয় করতেন; তাঁদের ছিটে-ফোঁটা কাহিনী নিয়ে কত গল্প, কত কাহিনী, কত নাটক সৃষ্টি হয়েছে। দিল্লীর ইতিহাস থেকে বাদশা-বেগমেরা বিদায় নিয়েছেন; পারসীয়ান কার্পেট ঝাড়লণ্ঠন-শোভিত প্রাসাদ থেকে নূপুরের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দরবারী কানাড়া আজ

আর কানে ভেসে আসে না। কিন্তু দিল্লীর নাট্যশালা আজও জমজমাট। নতুন নাটক, নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও বেশ জমিয়ে রেখেছেন। আমি শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মত সে অভিনয় দেখে চলেছি।

পার্লামেন্টের প্রায় সাড়ে সাতশ' মেম্বারের মধ্যে শ'খানেক এম-পি'র নাম খবরের কাগজের পাতায় মাঝে মাঝেই ছাপা হয়। দেশের লোক এঁদের জানে ও চেনে। পরবর্তী শ'খানেক পার্লামেন্টারী সার্কেলে পরিচিত। আরো শ'খানেক আছেন, যাঁরা মাঝে মাঝে 'মে আই নো স্যার' বলে প্রশ্ন করেন বা কদাচিৎ-কখনো এক-আধটু বক্তৃতাও করে ফেলেন। এরপর যাঁরা পড়ে থাকেন, এম-পি বলে তাঁদের নাম প্রায় অজ্ঞাত। কিন্তু কুঁজো বলে কি চিত হয়ে শু'তে ইচ্ছে করে না? অজ্ঞাতগোষ্ঠির এম-পি বলে কি মিনিস্টার হবার সাধ হয় না?

দাদা আমাদের তৃতীয় দফার এম-পি হবার গৌরব দাবী করতে পারেন। দাস ফার, নো ফারদার। আর কোন গৌরব আছে বলে জানা নেই। আজ-পর্যন্ত দাদার কণ্ঠস্বর লোকসভায় শুনেছি বলে মনে হয় না। কোঁচাটি ধরে, পাঞ্জাবি চড়িয়ে নধর দেহটি হেলিয়ে-দুলিয়ে দাদা লোকসভায় আসেন। মোটা পাথরের থামের আড়ালে লোকসভায় চক্রবালরেখার কাছাকাছি আসন গ্রহণ করে কিছুক্ষণ অবস্থান। অতঃপর সেণ্ট্রাল হলে এক কাপ কফি ও একটা গোল্ড-ফ্লেক সিগারেট সেবন। সর্বশেষে পার্লামেণ্ট মিল্ক বুথ থেকে একটি বিশুদ্ধ 'ঘী' এর টিন নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন। এই হলো দাদার পার্লামেন্টের জীবন কাহিনী। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর দাদা এভাবে পার্লামেন্টে নির্বাক সৈনিকের অভিনয় করে চলেছেন।

হাজার হলেও ইয়ংম্যান; তারপর বিলেত-ফেরত। দেশসেবার জন্য দাদার প্রাণটা প্রায়ই কেঁদে ওঠে। কিন্তু নেহেরু যেন কেমনতর?

কয়লা-খনিতে দাদা যে একটি আস্ত হীরকখণ্ড তা কি নেহরু বুঝতে পারেন না ?

বছর দশেক এম-পি থাকার পর দাদা একজন সেন্ট্রাল মিনিস্টারের নির্ভেজাল সাপোর্টার হবার গৌরব অর্জন করলেন। প্রায়ই সন্ধ্যায় সস্ত্রীক যাতায়াত শুরু করলেন এক বাংলো-বাড়ীতে। কিছুক্ষণ মন্ত্রী-সান্নিধ্য উপভোগ করবার পর ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে মন্ত্রীর আশীর্বাদ শিরোধার্য করে দাদা-বৌদি ফিরে আসেন নর্থ এভিনিউর ফ্লাটে। দাদা সব সময় যেতে পারেন না : নিরুপায় হয়ে বৌদিকেই একা যেতে হয় মিনিস্টারের বাংলোয়। শাড়ী-গহনা পরে হাতে ভ্যানিটিব্যাগ আর এক বাক্স কলকাতার সন্দেশ নিয়ে বৌদি তীর্থযাত্রায় রওনা হন। যাবার সময় দাদার কোলে আট মাসের শিশু-সন্তানটিকে আর ফিডিং বোতল ভর্তি দুধ দিয়ে বৌদি ট্যাক্সিতে চাপেন। মন্ত্রীর পাশে বসে বৌদি বেশ সুন্দর একটা পোজ মেরে ছবিও তুলেছেন। দাদাব নর্থ এভিনিউব ফ্লাটের ড্রইং রুমের সেন্টার টেবিলে সে ছবি দীর্ঘদিন শোভা পেয়েছে। তারপব এক মহেন্দ্রক্ষণে মন্ত্রীর আবির্ভাব হলো দাদার ফ্ল্যাটে। সহাস্য বদনে সি-পি-ডবলিউ-ডি'র ডিনার-টেবিলে পটলের দোরমা, ছোলার ডাল, কাঁচা লঙ্কা-সরষেবাটার ইলিশ মাছেব ঝাল, চিকেন মাটন ও ঘণ্টাওয়ালার মিষ্টি খেয়ে গোল্ডফ্লেকের প্রথম সুখটান মেরে মন্ত্রী বৌদির পিঠে এক চাপড় মেরে বললেন, বেশ খাওয়ালে।

তারপর মিনিস্টার কলকাতা গেলে দাদা-দৌদি গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে ডজনখানেক রজনীগন্ধার স্টীক কিনে ঠিক সময়মত হাওড়া স্টেশনে হাজির হতেন। ফেরার সময় দাদা মন্ত্রীর গাড়ীতে এক টুকরি মালদার ফজলি বা সের কয়েক নলেন গুড়ের সন্দেশ চাপিয়ে দেবেনই।

এমনিভাবে চলে দাদাব সাধনা। তারপর একদিন হাত কচলে মনের কথাটা বলেই ফেললেন, একটা কিছু না হলে তো আর পলিটিক্সে থাকা চলে না। মিনিস্টার আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন।

'আই উইল ডেফিনিটলি টেল প্রাইম মিনিস্টার অ্যাবাউট ইউ।'

জয় মা কালী! তবে বোধহয় অদৃষ্ট খুলল। রাষ্ট্রপতি-ভবন সার্কুলারে দাদার নাম খুঁজে পাওয়া গেল না। তবে নিজেই জানালেন, মিনিস্টার আশা করেছেন নেক্সট লিস্টে নাম থাকবে। কলকাতা এবং আশপাশ থেকে দাদার কাছে খানকতক গ্রিটিংস টেলিগ্রামও এলো। কনগ্র্যাচুলেশনস্। বেস্ট উইসেস্ ফর ইওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট এ্যাজ ডেপুটি মিনিস্টার।

মিস্‌ফরচুন নেভার কামস্ অ্যালোন। সেকেণ্ড লিস্টেও দাদার নাম খুঁজে পাওয়া গেল না। মুষড়ে পড়লেন দাদা-বৌদি দুজনেই। ক'দিন দাদাকে 'ঘী' এর টিন নিয়ে পার্লামেণ্ট-হাউস থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখলাম না। বুঝলাম, শকটা বেজায় রকমের হয়েছে। আমিও লজ্জায় টেলিফোন করতে পারছি না। এমন সময় একদিন বেশ গভীর রাত্রে আমার টেলিফোন বেজে উঠল···হ্যালো! সমস্ত কাহিনী আগেই জানা ছিল। শুধু বল্লেন, কি ব্যাপার বলুন তো। দেশের এই অবস্থায় ফ্রেস্‌ব্লাড না নিয়ে বুড়োগুলোকে দিয়ে নেহেরু কিভাবে গভর্ণমেণ্ট চালাবেন বলুন তো!

—'আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছি ক'দিন ধরে।'

—পলিটিক্স ছেড়ে প্রফেশনে লেগে যাব ভাবছি। পার্লামেণ্টে থেকে আর কি হবে বলুন। অনেক ত দেখলাম।'

আমি আর কি বলব। শুধু বললাম, 'পলিটিক্স ছেড়ে কি থাকতে পারবেন? তাছাড়া জানেন তো, 'নাইট ইজ দি ডার্কেস্ট বিফোর ডন···সূর্যোদয়ের আগেই তো, সব চাইতে বেশী অন্ধকার হয়। হাল ছাড়বেন না।' শেষে পরামর্শ দিলাম, 'হোয়াই নট টেল প্রাইম মিনিস্টার এভরিথিং? আপনার মত কোয়ালিফায়েড লোক আছে জানলে তিনি নিশ্চয়ই কিছু করবেন।'

নেহেরুর চিঠিটা ড্রাফট করার জন্যে পরের দিন দাদার বাড়ী আমার চায়ের নিমন্ত্রণ হলো। অনেক বুঝিয়েও কাজ হলো না;

যেতেই হলো। এস্টিমড্ পণ্ডিতজীর জন্য ছোট্ট চিঠিটা ড্রাফট্ করে দিলাম। রিহার্সাল দিয়ে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দিলাম।···বৌদির হাতে ফুল আর আপনি হাক্সলে বা রাসেলের একটা বই নিয়ে যাবেন। নেহরু পছন্দ না করলেও তাঁকে প্রণাম করবেন। তারপর সোজাসুজি বলবেন, কিছু করে দিন। ক'দিনের মধ্যেই প্রাইম মিনিস্টার্স হাউস থেকে চিঠি এলো। নেহেরুর একজন সেক্রেটারী লিখলেন.রেফারেন্স টু ইওর লেটার টু দি প্রাইম মিনিস্টার···প্রাইম মিনিস্টার উইল বি প্লিজড্ টু সী ইউ অ্যাণ্ড ইওর ওয়াইফ অন স্যাটারডে নেক্সট এ্যাট ফোর ফিফ্টিন পি এম এ্যাট হিজ অফিস।

সেদিন পাঁচটা বাজতে না বাজতেই আবার আমার টেলিফোন বেজে উঠল।···হ্যালো। নেহেরু আজ চমৎকার মুডে ছিলেন। আপনার বৌদি প্রণাম করতেই ওর হাত ধরে তুলে নিয়ে গালে একটা চড় মেরে বললেন, হোয়াট ইজ দিস? তারপর আমার কথা সব শুনে বললেন, তোমার কোয়ালিফিকেশন সম্পর্কে তো বলার কিছু নেই, তবে দেখি কি করা যায়।·· আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় বলুন তো!'

—'ইণ্ডিকেশনস্ আর গুড।'

—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।'

দাদার পরের কাহিনী লিখতে বুক ফেটে কান্না আসে। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই। পার্লামেণ্ট হাউস দেখলে যেন বিভীষিকা মনে হতো দাদার। তারপর সপরিবারে চলে গেলেন কলকাতা।

দীর্ঘদিন বাদে দাদা আবার ফিরেছেন দিল্লী। আবার টেলিফোন: হ্যালো, কামরাজ প্ল্যানে কে কে হচ্ছে বলুন। জুনিয়র মিনিস্টারদের মধ্যে কেউ যাবে নাকি? আমাদের কি কোন চান্স আছে?

এবার আর আমি কাঁচা কাজ করছি না। দাদাকে পরামর্শ

দিয়েছি, প্রথমে নেহেরুর সঙ্গে দেখা করে মনে করিয়ে দিন এবং তারপর—।

এদিকে পণ্ডিত কৃষ্ণমূর্তিও দিল্লীতে এসে গেছেন। পণ্ডিতজীর ঠিকানাটা দাদাকে দিতে ভুলে গেছি ; দু'একদিনের মধ্যে দিয়ে দেব।

এগার

শ্রীরামকৃষ্ণ না হয়েও যাঁরা মহাপুরুষ, তাঁরা এম-পি, তাঁরা পলিটিসিয়ান! এঁদের কীর্তি, কাহিনী, কথামৃতও অমৃত সমান। অনেক সময় শরৎ চাটুয্যের রসঘন উপন্যাসের চাইতে এঁদের কাহিনী কম আকর্ষণীয় নয়। বিখ্যাত মতিমহলের খাবার-দাবারের মতই এসব ঘটনা নানা মশলায় পূর্ণ ও মুখরোচক। তবে হ্যাঁ, যন্তর-মন্তর কুতুবমিনার-লালকেল্লার সঙ্গে কোনমতে পার্লামেন্ট দর্শন করলে দিল্লীকে তুষারমৌলী হিমালয়শৃঙ্গের মত গাম্ভীর্যপূর্ণ বলেই মনে হবে। কিন্তু আপনি যদি একটু রসিক ও কিছুটা ভবঘুরে হন, 'পরমপুরুষ'দের এক আড্ডা থেকে আর এক আড্ডায় ঘুরে বেড়াতে পারেন এবং সর্বোপরি অন্ততঃ সুপারফিসিয়্যাল মোসাহেবি করে শুধু মাথা নেড়ে নেড়ে কিঞ্চিৎ হেঁ হেঁ করে যেতে পারেন, তবে দেখবেন আপনার শূন্য ঝুলি পূর্ণ হয়ে গেছে।

···দিল্লীর কার্জন রোডের আশেপাশের এক গলির এক 'পরম পুরুষে'র আড্ডাখানায় একটা টিপস্ পেলাম।

'ভাইয়া, উপারসে উনকো মালুম হোগা বিলকুল মামলি আদমী, সিধাসাধা হিন্দী-প্রেমিক, মাগার অন্দর মে যো প্রেম হ্যায় ও অর কিস চিজকে লিয়ে।'

সত্যি একটা বারোআনা-চৌদ্দআনা গজের খদ্দরের পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে যেভাবে পার্লামেন্টে আসেন, তাতে তো নিতান্তই সাধারণ মানুষ বলে মনে হয়। বিজিনেস ব্রেন আছে বলে কেউ সন্দেহই করতে পারে না। কাজকর্ম কথাবার্তা শুনে মনে হবে হিন্দী

প্রেমে ইনি ভরপুর। তাঁর সরকারী বাংলোর দ্বারদেশে লটকান বিরাট সাইনবোর্ডটিও হিন্দিপ্রেমেরই ঝাণ্ডা বিশেষ।

কলিংবেল বাজিয়ে ভিতরে আসন নিতেই পাশের ঘর থেকে একসঙ্গে গোটাকতক রেডিওর আওয়াজ ভেসে এলো। বুঝলাম টিপস্‌টা ঠিকই। আমিও প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

দাদাজী ঘরে ঢুকতেই বললাম, বেশ গান শুনছিলাম। রেডিওটা তো ভারী চমৎকার।

ব্যস! এক চালেই দাদা আমার কুপোকাত।

'গান শুনবে? খুব ভালো কথা। আমি রেডিও আনছি।'

'নেই, নেই, রেডিও লেয়ানেকা কৈ জরুরত নেই হ্যায়। তাছাড়া ঘরের রেডিও টানাটানি না করাই ভাল। আর বাড়ির লোকেই বা তাহলে শুনবে কি?'

'আরে নেই ভাই, এইসে কৈ বাত নেই; ঘরবালোকে লিয়ে কাফি রেডিও হ্যায়।'

'কাফি?' আমাদের ঘরে একটা রেডিওই জোটে না, আর এঁর ঘরে 'কাফি'।

একটু মৃদু হেসে বললেন, হ্যাঁ ভাই তা সত্যি 'কাফি' 'আছে —আমার বেটার রেডিও'র কারখানা আছে কিনা!'

দাদাজী আমায় শুধু রেডিও দেখালেন না, কিনে নেবার প্রস্তাবও দিলেন। আর ট্রানজিস্‌টার! এর চাইতে ভালো পাওয়া মুস্কিল।

উই হ্যাভ ডেলিবারেটলি প্রাইসড্‌ ইট ভেরি লো···ওনলি থি সেভেনটি ফাইভ। তুমি নিয়ে যাও, কোন চিন্তা নেই, পরে দাম দিও।—দেখো দেখো বেস্ট ফরেন কনসার্নের কোলাবোরেশনে বানাচ্ছি—এদের সঙ্গে কোলাবোরেশন করা কি সহজ ব্যাপার। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কমার্স মিনিস্ট্রীকে অনেক বুঝিয়ে তারপর ওদেশে গিয়ে তবে এই কোলাবোরেশন সম্ভব হয়েছে। সত্যি ট্রানজিস্‌টারের উপরে লেখা দেখলাম, 'মেড ইন—'।

ট্রানজিস্‌টার বানানো হচ্ছে দিল্লীর এক বাংলো-বাড়ির রান্নাঘরে

আর তারই ললাটে লেখা 'মেড ইন'…। সাবাস সত্যবাদিতা! সাবাস দেশসেবা!…তবে হ্যাঁ, উপরের কেশটা নির্ভেজাল বিদেশী এবং ডিজাইনটাও নাকি সেই দেশের বিশুদ্ধ অনুকরণে তৈরী করা হয়েছে।

চা-চানাচুর খেতে খেতে কি কথায় যেন জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কলকাতা যান না?'

—যাই বৈকি, তবে বেশী নয়। ফরেন থেকে মালমশলা এলে কলকাতা পোর্ট থেকে খালাস করতে মাঝে মাঝে যেতে হয়। আর বলো না ভাই, কাস্টমস-এর যা ঝামেলা ছেলে সামলে উঠতে পারে না; তাই আমাকেই যেতে হয়।'

দিল্লীতে এঁদের মত নির্ভেজাল দেশসেবক দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠতে হয়। কিন্তু এঁরাই পার্লামেন্টে 'মহাশয় মে জ্ঞান-সাক্তা হু' (মে আই নো স্যর) বলে ঠেলে উঠে গণ্ডা গণ্ডা সাপ্লিমেণ্টারী করবেন, কেন এসব দুর্নীতি বন্ধ করা হয় না? কেন? কেন? কেন ইনক্যাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা করা হয় না?…ইজ ইট এ ফ্যাক্ট অমুক অফিসারের মেয়ের বিয়েতে অমুক বিজিনেসম্যান এসে একটা দামী প্রেজেনটেশন দিয়েছিলেন?

না?

কেন করেন না, সে প্রশ্ন তোলার আগে এইসব পরমপুরুষেরা যদি একটু আত্মানুসন্ধান করতেন তাহলে ভালো হত, তাই নয় কি?

বারো

সম্পদ ও সম্ভোগের তীর্থক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও মোগল সম্রাট শাজাহান জেনেছিলেন, 'ভুবনের ঘাটে ঘাটে—এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে'। প্রাণ-মন দিয়ে বাদশা উপলব্ধি করেছিলেন, 'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান'। রাজা-উজীর বাদশা-বেগম তো দূরের কথা, আজকাল বোধকরি পার্লামেন্টের বহু মেম্বারই ভুলে যান 'তোমাদের সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে

যেতে হয়।'—তাইতো দেখি কত ক্ষুদ্রতা। কালীবাড়ীর পাঁচ সিকার মাছের ঝোল-ভাত খেয়ে মালকোচা দিয়ে কাপড় পরে কাঁধে বক্স ক্যামেরা ঝুলিয়ে যাঁরা রাজধানী সন্দর্শনে এসে পার্লামেণ্টে আসেন, তাঁদের এসব নজরে পড়বে না।

শাস্ত্র বলে—উত্তরফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা, প্রভৃতি নক্ষত্রে শনি-মঙ্গলবার বাদে দ্বাত্মক বৃষ ও সিংহলগ্নে কেন্দ্র নবম পঞ্চম স্থানে শুভগ্রহ থকিলে চন্দ্রশুদ্ধ হইলে শুভতিথি যোগ ও করণে রাজদর্শন কর্তব্য। পিঁপড়ের মত সারি বেঁধে লাইন দিয়ে প্রতি পদক্ষেপে সিকিউরিটি গার্ডের কাছে 'পাশ' দেখিয়ে যাঁরা ভিজিটার্স গ্যালারীতে আসেন, তাঁরা কিন্তু এত বিবেচনা না করেই রাজধানীতে রাজদর্শন করে যান। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার পথে এক ঝলক মোরারজী বা শাস্ত্রীজীকে দেখলে তো কথাই নেই। পার্লামেণ্টের আসল মজা কিন্তু এখানেই শেষ হয়!

পার্লামেণ্ট হাউসের পোস্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ অফিসে প্রেস মেসেজগুলো গুছিয়ে দিয়ে খানকয়েক পোস্টকার্ড আর'লিফাফা' কিনতে লাইন দিয়েছি। কাউণ্টারের আশেপাশে এম-পি-দের ভিড়ের মধ্যে দু'চারজন রিট্রেঞ্চড্ সেণ্ট্রাল মিনিস্টার ও এক্স-গভর্ণর নজরে পড়বেই। এককালে মা বসুন্ধরা পর্যন্ত এঁদের ভারে কেঁপে উঠতেন; কিন্তু আজ! আমার মত লোকের সঙ্গে পোস্টাফিসে লাইন দিচ্ছেন, সেণ্ট্রাল হলে পাঁচবার তুড়ি আর বার দশেক ইসারা করেও এক কাপ কফি পান না। সত্যি বলছি, এঁদের দেখে বুক ফেটে কান্না আসে। বিশ্বাস করুন দণ্ডকারণ্যগামী রিফিউজীদের চাইতেও এঁদের চোখে বেশী হতাশা। এককালে যে হাসি-খুশী মুখের ছবি কাগজে ছাপা হতো, সে আজ কালিমায় ভরা।

কথায় বলে ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। এঁরাও অনেকটা তাই। এঁদের কর্তৃত্ব নেই, কিন্তু অস্তিত্ব আছে। সামনা-সামনি পড়ে গেলে প্রাইম মিনিস্টারের শুকনো হাসি ছাড়া এঁদের অদৃষ্টে আর বিশেষ কোন সৌভাগ্য জুটে না এবং অধিকাংশের ক্ষেত্রে

ভবিষ্যতেও কোন সম্ভাবনা নেই। ছোকরা এম-পি'র দল এঁদের প্রায় ধাক্কা মেরেই চলেন। কি বলব সেণ্ট্রাল হলের আড্ডাখানায় এঁদের জুড়িদারও জুটে না। কিন্তু তাহলে কি হয়। দিল্লীর বাইরে এঁরা আজও এমন 'লেকচার' দেন যে, মনে হবে উঠতে-বসতে নেহরু এদের তলব না করে পারবেন না।

এক মহাপুরুষ বলেছেন, 'কিউরিওসিটি ইজ এ ফেমিনাইন ভাইস'। নারীপুরুষ নির্বিশেষে সাংবাদিকদের পক্ষে 'কিউরিওসিটি' একটি অবশ্য গুণ। তাই পার্লামেণ্ট হাউসের করিডর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটি হৈ-চৈ দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভিড়ের মধ্যে একজন একটু অতিখ্যাত এম-পিকে দেখলাম। ইনি একাধারে শিক্ষাবিদ্, ডিপ্লোম্যাট, রাজনীতিবিদ্, ঐতিহাসিক এবং আরো অনেক কিছু। এমন এক মহাজনের 'পে বিলে' আনা ছয়েক কম। আর যাবেন কোথায়। তলব পড়ল এল-ডি-সি থেকে হাজার দু' হাজারের বড় কর্তাদের। কর্মক্লান্ত অফিসারবৃন্দের কয়েক ঘণ্টার সম্মিলিত পরিশ্রমে আবিষ্কার হলো, বাড়ীভাড়ার হিসেবে ভুল করেছে, এস্টেট অফিস'। টেলিফোনে তলব পেয়ে এস্টেট অফিসের জন কয়েক কর্তা ছুটে এলেন। মুহূর্তের মধ্যে এঁরা বুঝিয়ে দিলেন, আগেরবার বাড়ী-বদলের সময় অনারেবল মেম্বারের তাঁর কোয়ার্টারের সঙ্গে এ্যাটাচড (মাসিক দশ টাকা ভাড়ার) সারভেণ্টস কোয়ার্টার খালি করতে একদিন দেরী হয়ে যায় এবং সে কারণেই বাড়ী ভাড়া বাবদে আনা ছয়েক বেশী কেটে নেওয়া হয়েছে।

ছড়ি ঘুরাতে ঘুরাতে নিঃশব্দে প্রস্থান করলেন 'অনারেবল মেম্বার'।

বক্তৃতার রসদ জোগাবার জন্য সরকার এম-পিদের নিত্য বাণ্ডিল বাণ্ডিল কাগজ দিয়ে থাকেন। হিন্দী অথবা ইংরেজী যে-কোন একটি ভাষায় এম-পিরা এই সব কাগজপত্র নিতে পারেন। শুনেছি কিছু-কাল আগে একজন মহিলা এম-পি কোনমতে সই দিয়ে নিয়মিত হিন্দী কাগজপত্র নিয়ে যেতেন ঃ হঠাৎ একদিন ইনি দাবী করলেন,

ইংরেজী পেপার্সও চাই। গোনাগুন্তি কাগজ বেশী কম হলেই বিপদ। কর্মচারীটি সানুনয় করে নিবেদন করল, মাতাজী তুটো ল্যাঙ্গোয়েজের কাগজ দেবার হুকুম নেই; তাছাড়া একটা সেটও এক্সট্রা নেই। মাফ কর মাতাজী। মাতাজী কিন্তু সন্তানের আবেদন-নিবেদনে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। হামারা দোঠো সেট জরুর চাইয়ে। অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর কর্মচারীটি নাকি হঠাৎ বলে ফেলেছে আপনি তুটো ল্যাঙ্গোয়েজের পেপার্স নিয়ে কি করবেন বলুন?

ব্যস! আর যাবেন কোথায়! পার্লামেণ্ট হাউসে অনারেবল মেম্বারের অসম্মান তাঁর প্রিভিলেজ নিয়ে টানাটানি। নালিশ শুনে ছুটে এলেন কর্তাব্যক্তির দল। যা দেবী সর্বভূতেষু এম-পি-রূপেন সংস্থিতা বলে সন্তান মা'র চরণযুগল জড়িয়ে ধরলেন। হাজার হোক মায়ের জাত তো। দশ মাস দশ দিন না হয় গর্ভে ধারন করেননি তবু 'মা' বলে তো ডেকেছে! মায়ের অধরে হাসি দেখা দিল, যাও বেটা মাপ কর দিয়া।

সে যাত্রায় মূর্খ সন্তান ও পার্লামেণ্টরী ডেমোক্রাসী কোনক্রমে রক্ষা পেলো।

তেরো

হেলেন অফ ট্রয় বা ভীমসিংহ পত্নী পদ্মিনী সবকালে না হোক সর্বদেশে নিশ্চয়ই আছে। বৃটেনে মিস (?) কিলারের আবির্ভাব তারই সর্বশেষ প্রমাণ। পুরুষের জীবনে নারী, নারীর জীবনে পুরুষের আসা-যাওয়ার কাহিনী নতুন নয়, কিন্তু এই চিরন্তন কাহিনীর প্রকাশ রাজনীতিবিদের জীবনে ঘটলে আলোচনা-সমালোচনার অন্ত থাকে না। রাজনীতিবিদদের জীবনেও যে একটা একান্ত নিজস্ব সত্তা থাকতে পারে, একথা কেন জানি না আমার স্বীকার করতে চাই না। কত অধ্যাপক কত ছাত্রীর প্রেমে পড়ছেন, কত সন্ন্যাসী কত শিষ্যাকে বিয়ে করেছেন কিন্তু তা খবরের কাগজের

পাতায় বেরুবে না! অথব পলিটিসিয়ানরা একটু ছুষ্টুমি করলেই তা নিয়ে সংবাদপত্র ও জনসাধারণের মধ্যে ঝড় উঠবে।

বেচারা প্রোফুমোর মঙ্গল শুধু নিচস্থই নয়, শনিও নিশ্চয়ই তুঙ্গী"; কারণ তা না হলে ওয়ার মিনিস্টারের অদৃষ্টে এমন পলিটিক্যাল ওয়ারের সম্মুখীন হতে হতো না। আমাদের দেশের রাজনৈতিক ছুনিয়াতে বিনোদবিনোদিনী যে নেই, একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। তবে এঁদের শনি বক্র বা তুঙ্গী নয়; তাইতো সেই ভাগ্যের চূড়ায় চূড়ায় এঁরা নির্বিচারে ঘুরে বেড়ান?

—ছুজনকে নিয়ে অনেক দিনই গুজব শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। বছর দেড়েক আগে একদিন একটু বেশী রাতে অশোকা হোটেলের পর্টিকোর পাশে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছি; সামনের লনে বাহুবদ্ধ এক যুগল মূর্তি নজরে পড়ল। নানা মহলে এতদিন যাঁদের নিয়ে নানা গুজব শুনেছি এঁরা তাঁরাই।

কিছুদিন পরে সেণ্ট্রাল হলের আড্ডাখানায় ক্যাশুনাট চিবুতে চিবুতে দিদি বল্লেন, আরে ভাই, ওদের কথা আর বলো না।

—কেন ওঁরা আবার কি করলেন?

—তবে শুনে রাখো ওঁদের এক কাহিনী। জাপান গেছি এক ডেলিগেশনে। একদিন সকালে আমাদের টোকিও'র বাইরে যাবার প্রোগ্রাম। সময় মত যে যার গাড়ীতে উঠেছেন। চেক্‌আপ করতে গিয়ে দেখা গেল ঠিক ওঁরা ছুজনেই টার্ণ আপ করেননি? ঘরে খবর নিতে গেলে ভদ্রমহিলা জানালেন, তাঁর শরীর খারাপ, সারাদিন হোটেলেই রেস্ট নেবেন।...ভদ্রলোকের ঘরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তাঁরও শরীর খারাপ; তিনিও কমপ্লিট রেস্ট নেবেন।...

ওঁদের ছুজনের খবর শুনে সবাই একটু মুখ টিপে হাসলেন; সামনে কেউ আর কিছু বললেন না। আর বলবেনই বা কি বল!

গুরুগম্ভীর বলে দিদির সুনাম আছে; তাই এ কাহিনী শুনে একটু আশ্চর্যই হলাম।

—তাহলে দিদিরও নজর পড়েছে?

—ওঁদের প্রতি কার নজর না পড়েছে বল!

• ইমার্জেন্সীতে এঁদের ইন্টিগেশন আরো ভালভাবে হয়েছে বলে মনে হয়। ঠিক জানি না, তবে গুজব শুনছি ভদ্রমহিলা ডিভোর্সের দরখাস্ত করেছেন বা করতে চলেছেন নতুন স্বামীর দ্বিতীয়া পত্নী হবার আশায়। শুনেছি অরক্ষণীয়ার প্রেম থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু বিবাহিতাব প্রেমে বিসর্জন নাকি অনিবার্য। আগে স্বীকার করতাম না, তর্ক করেছি; এনন কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা করব না।

* * *

উড়ে বলে কি বামুন নই। লেফটিস্ট বলে কি রাজা-রাণী বাদশা-বেগমের সঙ্গে খাতির জমাতে নেই! কে বলে নেই, গো অন কমরেড!

কমরেড মধ্যবয়সী ও রূপবান। কোশ্চেন, সর্ট নোটিশ কোশ্চেন, এ্যাডজর্নমেন্ট মোশান, কলিং এ্যাটেনশন নোটিশ ও ডিবেটে পার্টিসিপেট করে কমরেড সুনাম অর্জন করেছেন পার্লামেণ্টারী সার্কেলে। পার্টি সার্কেলের বাইরে মেলামেশা বা আড্ডা দিতে কমরেডকে বিশেষ দেখা যায় না। হঠাৎ এ হেন কমরেডকে এক মহারাণীর সঙ্গে বেশ মেলামেশা করতে দেখা গেল। প্রায়ই একসঙ্গে চা-কফি স্ন্যাকস্ খেতে খেতে হাসি-ঠাট্টা করতে দেখলেন অনেকে।

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের ছবির মত তুজনকে একদিন কাউন্টারে হেলান দিয়ে কোকোকোলা খেতে দেখা গেল। হাসতে হাসতে তুজনে তুদিকে বিদায় নিলেন।

কয়েক পা এগুতেই এক বন্ধু কমরেডকে পাকড়াও করলেন। কানে কানে ফিসফিস করে বলেছিলেন, ভায়া, কোকোকোলায় কিছু হবে না; ইউ মে ট্রাই এফ ইউ বিগিন উইথ স্যাম্পেন। কোকোকোলায় রাজা-রাণীর মন গলে না।

* * *

এক এম-পি'র প্রতিবেশিনী ছিলেন সুন্দবী স্বল্পবয়সী আর এক এম-পি। শিক্ষিতা যুবতী মহলের আলোচনায় ভদ্রলোক নিত্য

আলোচিত হন বলে শুনেছি। আর ভদ্রমহিলার ফ্রিলি মুভ করে বেড়াবার সুখ্যাতি আছে দিল্লীর রাজনৈতিক মহলে। কিছুদিনের মধ্যেই ভদ্রলোক প্রতিবেশিনীর প্রতি অহেতুক আত্মীয়তা দেখাতে শুরু করেছিলেন বলে শুনেছি।

একটু রাত্রি বা নিশ্চিন্ত ছুটির মধ্যাহ্নে সুঁচের সুতো বা এক কাপ চায়ের দু'চামচ চিনির জন্য ভদ্রলোক নাকি প্রায়ই উদয় হতেন প্রতিবেশিনীর ঘরে। কখনও কখনও নাকি এসে বলতেন, ইম্পিরিয়ালের সামনে টিবেটিয়ান কিউরিও সপে এটা পেলাম। কি সুন্দর তাই না? রেখে দিন আপনার ঘরে বেশ মানাবে।···আবার নাকি কখনও এসে বলতেন, 'ক্যাডবেরির নাটস্' বেশ চমৎকার করেছে, খেয়ে দেখুন।

ভদ্রমহিলা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন; নিরুপায় হয়ে শেষে কোয়ার্টার পাল্টে দূরে সরেছেন।

মেয়েদের প্রতি ভদ্রলোকের আতিশয্য সম্পর্কে ঊর্ধ্বতম মহলে দু'একবার নাকি নালিশও হয়েছে।

* * *

রাজধানীর নানা আড্ডায় আরও কত কাহিনী শুনি। কোন এক প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে এক ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রীর প্রেমের কাহিনী বলতে গিয়ে এক বন্ধু বলেছিলেন, ভাই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে, এসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। ওদের তো এক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ছিল, অনেক কর্তাই ঐ কোম্পনীর শেয়ার হোল্ডার ছিলেন।

রাজধানীর কর্মব্যস্ত রাজনৈতিক জীবনের আড়ালে অনেক নাটকই নিত্য অভিনীত হচ্ছে। সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে এগিয়ে গেলে বিরাট দুনিয়া পাওয়া যাবে।

চোদ্দ

রাত্রি তখন প্রায় এগারটা। কোন একটা জরুরী খবরের

কনফারমেশনের জন্য শাস্ত্রীজির বাড়ীতে অপেক্ষা করছি। ঘরের ভিতরে মধ্যপ্রদেশের চীফ মিনিস্টার মান্দোলি আর বাইরে প্রতাপ সিং কায়রণ এবং আরো দু'একজন হোমমিনিস্টারের জন্য অপেক্ষা করছেন। শাস্ত্রীজির পার্সোনাল স্টাফেরা কেউ দৌড়াদৌড়ি করছেন, কেউ টাইপ করছেন আর কেউ বা দু'কানে তিনটে টেলিফোনে কথা বলছেন। কিন্তু তারই মধ্যে আমরা এক-ছটাক আধ-ছটাক আড্ডাও মারছি।

হঠাৎ ললাটে লাল আলো জ্বালিয়ে একটা বিরাট গাড়ী এলো। সিকিউরিটিম্যান ও চাপরাশীরা বুঝল রাষ্ট্রপতি ভবনের গাড়ী চড়ে কোন ভি-আই-পি এলেন। তারা দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল। হাস-মুখে ছড়ি হাতে বেরিয়ে এলেন একজন বয়স্ক লোক। পরনে বেশ দামী প্যাণ্ট ও বাটেমড্-আপ কোট। বলা বাহুল্য মাথায় ছিল গান্ধী ক্যাপ্। কমব্যস্ত পি-এ'র দল হাতের কাজ ফেলে উঠে যেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জনাবার আগেই ভদ্রলোক তাঁবুতে এসে গেলেন। কিছু না বলে একটা চেয়ার টেনে আমার পাশে বসে পড়লেন।

—আবে সাহাব, কিয়া হাল হ্যায়? সব খবর ভাল?

শাস্ত্রীজির পার্সোনাল এ্যাসিস্টেণ্টের প্রশ্নোত্তরে সাহেব জানালেন খবর ভালই। সৌজন্য প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের খবর ভাল তো?

সাহেবকে ভিতরে যেয়ে সোফায় বসতে অনুরোধ জানান হলো। কিন্তু কেন জানি না তিনি পি'এদের মধ্যে ছেড়া তাঁবুতে আমার পাশেই বসে রইলেন। বললেন, ওখানে যেয়ে কি করব, এখানে বেশ আছি।

কিছুক্ষণ বাদে মান্দোলিকে বিদায় ও কায়রণকে ভিতরে নিয়ে যাবার জন্য বেরিয়ে এলেন শাস্ত্রীজি। আমার পাশের সাহাব ছড়ি ভয় দিয়ে দু'পা এগিয়ে যেতেই শাস্ত্রীজির নজর পড়ল। দুজনেই দুজনের দিকে এগিয়ে এলেন। 'কার্টসি' এক্সচেঞ্জের পর দুজনের মধ্যে কথা হলো মিনিট কয়েক। কায়রণকে নিয়ে শাস্ত্রীজি ভিতরে

গেলেন, মহারাজ সাহাব লাল আলো (বাতি নয়) জ্বালিয়ে নাম্বার প্লেটবিহিন 'সত্যমেব জয়তে' মার্কা গাড়ীতে বিদায় নিলেন।

সাহেবের মুখখানা চেনা চেনা মনে হলেও, পরিচয়টা ঠিক মনে পড়ছিল না। পাশ ফিরে শাস্ত্রীজির এক পি-একে জিজ্ঞাসা করলাম হ্যাঁ ভাই, ভদ্রলোককে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

—-আরে সাহাব আমাদের গভর্ণর।

...গভর্ণরদের তিনটে পাইলট হাঁকিয়ে ঘোরাফেরা করতেই আমরা দেখি। আমার মত বিত্তহীন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের দল শুধু হাঁ করে চেয়ে থাকি। হেড এ্যাসিটেণ্টের চরণে তৈলমর্দন আর হাজার বারোশ' আণ্ডার সেক্রেটারীদেই দেবতা জ্ঞান করে যাদের জীবন কাটে তাঁরা শুনে সুখী হবেন যে, লাট সাহেবদেরও অন্ততঃ দু'একটা জায়গায় হেঁ হেঁ করতে হয়।

আর একটি ঘটনা বলছি। তখন পন্তজী বেঁচে। কেরালার সেণ্ট াল ইন্টারভেনশনের পর মিড-টার্ম ইলেকশন হবে। ইলেকশনের ঠিক আগের দিন সন্ধ্যায় পন্তজীর বাড়ীতে তাঁর পার্সোনাল সেক্রেটারী জানকীর ঘরে বসে আছি। হঠাৎ ট্রাংকল। স্পীক্ অন টু ত্রিভ্যানড্রাম্।

—হ্যাঁ সাব, কিযা হাল হ্যায়? জানকী চীৎকার করলো। আবার বললো, হোল্ড অন, জিজ্ঞাসা করে বলছি।

টেলিফোন রেখে জানকী পন্তজীর কাছ থেকে ঘুরে এলো। টেলিফোন তুলে নিয়ে বললো, ভীষণ কাজে ব্যস্ত, টেলিফোনে কথা বলার সময় নেই। কি বলতে চান বলুন, আমি বলে আসছি।

আবার কি যেন শুনে জানকী ভিতরে গেল। ফিরে এসে বললো, উনি বললেন আপনার দিল্লী আসার দরকার নেই। ইলেকশনের রেজাল্ট তো সঙ্গে সঙ্গেই এখানে জানা যাবে। যদি আপনাকে দরকার হয়, তবে পরে আপনাকে জানানো হবে।

ট্রাংকল শেষ হলো। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, কেরালা গভর্ণর হিজ একসেলেন্সী ডক্টর বি রামকৃষ্ণ রাও টেলিফোন করছিলেন।

হা ভগবান! হোম মিনিস্টারের সঙ্গে একটু সরাসরি কথাও বলতে পারলেন না লাটসাহেব। তবে যাঁরা স্বীয় বৈশিষ্ট্যে ও প্রতিভায় লাটসাহেবের গদী দখল করেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে দিল্লীর নেতারাও মাথা নত করেন হাসিমুখে। কিন্তু এই রকম লাটসাহেব আর কজন!

পনের

প্রফেসর প্রশান্ত মহালনবীশের চেলা আমি নই, তাই সংখ্যাতত্ত্বের ধার দিয়েও মাড়াই না। জানি; প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ জন্ম নিচ্ছে, প্রেমে পড়ছে এবং মরণকে বরণ করে নিচ্ছে। এদের সঠিক সংখ্যা আমার জানা নেই এবং জানার প্রয়োজনও নেই। কেউ প্রেমে পড়লে তার চোখে সারা পৃথিবীর রং বদলাবে, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার পূর্ণাহুতি হিসেবে প্রথম পুত্রের জন্ম তাদের নতুন উন্মাদনা এনে দেবে এবং একজনের মৃত্যু হয়ত সারা পরিবারকে শোকাচ্ছন্ন করে দেবে। ব্যক্তিগত বা পরিবারগতভাবে এর প্রত্যেকটির মূল্য অসীম; কিন্তু এই বিরাট সমাজ-সংসারের তাতে কিছু যায় আসে না।

কথায় আছে ভাগ্যবানের (বা ভাগ্যবতীর) বোঝা ভগবান বয়। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ বা ভগবান শ্রীচৈতন্যের কনটেমপোরারি আমি নই; তাই এই প্রবাদবাক্যের সত্যতার পক্ষে কোন ঘটনার নজীর দেওয়া আমার সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, এমন নজীর জানা আছে যখন একজনের নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আর পাঁচজনের চিন্তার (বা আলোচনার) শেষ থাকে না। বালী গ্রামের শ্যামাপদ পণ্ডিতের কাছে শুনেছি, শাস্ত্রে লেখা আছে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'। সুতরাং বিবাহিতা মহিলার সন্তান হওয়াটা শাস্ত্রাজ্ঞা পালন বই আর কিছু নয় এবং এ নিয়ে অন্যের চিন্তা (বা দুশ্চিন্তা) হওয়ার কোন যুক্তি নেই। 'লজিক' বা ন্যায়শাস্ত্র কন্‌সাল্ট করে জীবনে সব কাজ করা সম্ভব তো দূরের কথা, কল্পনারও অগোচর। তাই মানুষ বহু যুক্তিহীন কাজ করে এবং সে কারণেই জীবন হয়ে ওঠে জীবন্ত নাটক।

এত দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা করে যে কথা বলতে চাই, সেটি বিশেষ কিছুই নয়; অন্ততঃ তাতে আমার কোন আগ্রহ নেই। তবে নিষ্ঠাবান সাংবাদিক হিসেবে অপর পাঁচজনের আগ্রহ উপেক্ষা করতে পারি না বলেই লিখছি। পৃথিবীর কোটি কোটি মহিলার মত আমাদের এক কেন্দ্রীয় ডেপুটি মিনিস্টার সম্প্রতি একটি সন্তানের জননী হয়েছেন। ব্যাপারটী এমন কিছু গুরুতর নয়; কিন্তু একে ভি-আই-পি তার উপর পার্লামেণ্টের গ্ল্যামার কুইন। সুতরাং সেণ্ট্রাল হলের আড্ডাখানায় 'টেমপেষ্ট ইন্ এ টি পট' উঠে গেল এই আলোচনাকে কেন্দ্র করে।

যাকেই জিজ্ঞেস করি 'কিয়া খবর,' সেই বল খবর আর কই। তারপরই কানে কানে ফিসফিস করে বলেন, খবর তো একটাই। কিছুদিন ধরে পার্লামেণ্টে যেখানেই তাকাই না কেন, সেখানেই দেখি ক'জন মিলে কি যেন ফিসফিস করে আলোচনা করছেন। আমাদের মতো ছেলে-ছোকরাদের যোগদানে কোন আপত্তি নেই; ববং কিছু কনট্রিবিউট করলে সবাই খুশীতে আটখানা হয়ে পড়েন। এসব আলোচনায় বয়ঃবৃদ্ধ অথচ রসিক এমন বহু এম-পি'ও যোগদান করেন। পার্লামেণ্টের এবারের বাজেট সেসন বড়ই 'ডাল' চলছে। কৃষ্ণমেনন যতদিন মন্ত্রী-ছিলেন, ততদিন তাঁর নিন্দা করেই বহু এম-পি দেশসেবা করছিলেন এবং তাঁকে নিয়েই সেণ্ট্রাল হল গুলজার হতো। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে কৃষ্ণ মেননের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু পলিটিসিয়ান ও করস্পনডেণ্টও বেকার হয়ে পড়েছেন। হাতের কাছে আর ছিল কে, ডি মালব্য। কিন্তু যেই বোঝা গেল তিনি ইলেক্শন ফাণ্ডের জন্য কলকাতার ব্যবসাদারদের কাছ থেকে টাকা উঠিয়েছিলেন, অমনি বিপ্লবী কংগ্রেসী এম-পিদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গেল। মনে হয় ব্যবসাদারের কাছ থেকে ইলেকশন ফাণ্ডের জন্য চাঁদা জোগাড় করেননি, এমন এম-পি'র সংখ্যা বিরল। সুতরাং আলোচনার একমাত্র বিষয় রইল গ্লামার-কুইন-এর সন্তান হওয়া।

ফিল্মস্টারদের মত পলিটিসিয়ানদেরও 'বক্স-অফিস' এবং 'ফ্যান'

থাকে। যেমন ধরুন নেহরু। রাজনীতির ক্ষেত্রে এঁর সমতুল্য 'স্টার' আর কেউ নেই এবং এঁর 'ফ্যান' এর সংখ্যা কোটি কোটি। পার্লামেন্টেও এর পরিচয় পাওয়া যায়; যেদিন নেহরু নেই, সেদিন হাউস ফাঁকা, গ্যালারী ফাঁকা। বক্স-অফিস ও ফ্যান-এর দিক থেকে আমাদের আলোচ্য ডেপুটি মিনিস্টার-সাহেবা খুব টপ পজিশনের স্টার। পার্লামেন্টে 'সিক্রেট পোল' নিলে হয়ত দেখা যাবে এঁর জনপ্রিয়তা নেহরু ও শাস্ত্রীজির পরেই।

বয়স চল্লিশের ঘরে হলে কি হবে, দেখলে মনে হবে যেন চব্বিশ। তারপর ঠোঁটে হাসি, চোখে কাজল। প্রৌঢ় ও বুড়ো এম-পি'দের মনে দোল দেবার জন্য কি চাই বলুন? রং-এর উপর রসান চড়াবার জন্য আছে আধা-কাঁচা আধা-পাকা কিছু করসপনডেন্ট।

—'ইউ লুক ওয়াণ্ডারফুল টু ডে।' মন খুলে কথা বলার সুখ্যাতি আছে ভদ্রমহিলার। তাই উত্তর শুনি, 'কেন অন্য দিন কি ভাল লাগে না?'

মাঝখান থেকে ফোড়ন কেটে বললাম: 'কট্‌কি ব্লাউজ আর কাঞ্জিভরম শাড়ীর চমৎকার কম্বিনেশন করেছেন কিন্তু আজ।'

—'কেন, ইজ টেলারিং ভেরি ব্যাড?'

ইঙ্গিত বুঝতে কষ্ট হয় না। তাই মজায় আর আনন্দে হেসে ফেলি আমরা সবাই।

একদিন সেন্ট্রাল হলে এক কোণে দেখি বেশ ক'জন ঘিরে রেখেছেন গ্লামার-কুইনকে। ভিড় ঠেলে যখন কাছে এলাম, তখন চিট্‌-চ্যাট্‌ প্রায় শেষ।

—'আর দেরী করব না, এখনও লাঞ্চ হয়নি।' পাশের একজন বয়স্কা মহিলাকে দেখিয়ে বললেন, আজ আর নয়; আপনাদের সঙ্গে বক্ বক্ করার জন্য তো আর ছোট বোনকে না খাইয়ে রাখতে পারি না!

হা কপাল! উনি ওঁর ছোট বোন; দেখে তো মনে হয় ঠিক উল্টো।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলেই ফেললেন, দেখে তো মনে হয় আপনিই ওঁর ছোট বোন।'

'—দেহের মাধুর্য বজায় রাখার ক্ষমতা সবার থাকে না; আমার আছে, ওঁর নেই।'

চটপট উত্তর দিয়ে চলে গেলেন ডেপুটি মিনিস্টার-সাহেবা।

প্রেস গ্যালারী থেকে নজরে পড়ে হাউসের মধ্যেও কম মজা হয় না। সব কথা লেখা সম্ভব নয় আর 'স্পেস'ও নেই। তবে জেনে রাখুন, দুষ্টুমি শুধু স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরাই জানে না; আমাদের 'জুনিয়র' মিনিস্টার ও এম-পি'রাও কম নন।

ষোল

আগেই বলে নিচ্ছি 'ফর এ্যাডালটস্ ওনলি'।

ষোল-সতের হাজার ফিটের বাংলা ছবির একেবারে গোধূলি লগ্নে আবেগের তাড়নায় মুহূর্তের জন্য নায়ক-নায়িকাকে আলিঙ্গন করলে সারা বাংলাদেশে ছিছি রব পড়ে যায়। কলকাতার স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের চোটে রাধা-পূর্ণতে প্রথম দু'সপ্তাহ সীট পাওয়াই দুষ্কর। মাসখানেক পরে দিদি-বৌদিরা এই ছবি দেখার চান্স পান; আর সেই চরম সিনটা এলেই বলতে শোনা যায়ঃ ছিঃ ছিঃ দিদি, একি ব্যাপার!

কিন্তু যান মেট্রো, লাইট হাউস অথবা আমাদের এখানকার রিভোলি প্লাজাতে; মুহূর্তে দেখবেন লানা টার্ণার অথবা সোফিয়া লরেনের তান্ত্রিক সাধনার প্রকাশ। অন্ততঃপক্ষে হাজার খ'নেক আলিঙ্গনের দৃশ্য ও আনুসাঙ্গিক 'ডোজ' না থাকলে হলিউডের কোন ছবিই বোধকরি এ্যাকাডেমী এ্যাওয়ার্ড পেতে পারে না। কিন্তু তবুও সে ছবি দেখতে আমাদের বাধে না; তেমনি বাধে না কলকাতা থেকে দিল্লী এসে এখানকার মেয়েদের দেখতে।

রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের জন্য গান্ধীজি লণ্ডন গেলে বিলাতী সাংবাদিকরা তাঁকে ঠাট্টা করেছিলেন 'হাফ নেকেড' বলে। শুনেছি তার উত্তরে গান্ধীজি বলেছিলেন, পুরুষ হয়ে আমি যদি 'হাফ নেকেড'

হই, তবে তোমাদের দেশের সব মেয়েরাই পুরোপুরি 'নেকেড'। গান্ধীজি স্বর্গে গেছেন। কারণ আজকের দিল্লীর ললিতা সখীদের পোশাক দেখলে তিনি বিলিতি মেয়েদের এত কড়া কথা বলতে সাহস বা উৎসাহ কোনটাই পেতেন না।

সম্প্রতি রাজধানী দিল্লাতে এক বিখ্যাত ক্লথ মিলের সৌজন্যে 'ফ্যাশান প্যারেড' হয়ে গেল। পরের দিন প্রভাতী সংবাদপত্রে বেরুল তার ছবি। দিল্লীর সবচাইতে বিখ্যাত কাগজে যে ছবিটি বেরুল, সেটি লণ্ডনের 'ডেলী মিরর' ছাড়া অন্য কোন বিলিতী কাগজেও নিশ্চয় ছাপাত না। সাধারণতঃ প্রায় এ ধরণের ছবি নিয়েই কলকাতার চৌরঙ্গীর অলি-গলিতে ব্যবসা চলে কিন্তু সে ছবিই ছাপা হলো কোনো একটি বিখ্যাত সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় একেবারে 'টপ সেণ্টার ডবল কলম'। দিল্লীর অন্যান্য সংবাদ-পত্ররাও খুব বৈষ্ণব ভাব দেখাননি ; ফ্যাশান প্যারেডের প্রতি তাঁরাও যথাকর্তব্য পালন করেছিলেন। এমন একটা কাণ্ড হয়ে গেল, কিন্তু রাজধানীর লক্ষ লক্ষ সংবাদপত্র পাঠকদের মধ্যে বিন্দুমাত্র আক্ষেপ দেখা গেল না। আক্ষেপ করার অবশ্য কোন কারণ নেই ; এ দৃশ্য দেখতে তো অনভ্যস্ত কেহ নয়।

শুনেছি রূপ-যৌবনের খেলা দেখিয়ে রম্ভা, উর্বশী, মেনকারা মুনিঋষিদের ধ্যানভঙ্গ করতেন। তাঁরা আজ কোথায় জানি না ; তবে দেখে-শুনে মনে হয় দিল্লীর মেয়েরাই রম্ভা-উর্বশী-মেনকার ম্যানেজিং এজেন্সী নিয়ে বসে আছে। রূপ-যৌবনের খেলা দেখাবার এমন অসাধারণ ক্ষমতা দিল্লী ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোন জায়গায় মেয়েদের নিশ্চয়ই জানা নেই, অন্ততঃ চোখে পড়েনি। সন্ধ্যাবেলায় জনপথের রিফিউজি মার্কেটের সামনে রূপ-যৌবনের যে জীবন্ত ও চলন্ত প্রদর্শনী দেখা যায়, প্যারিসের সাঁজে এলিজেতেও তেমনি দেখিনি। চলতে-ফিরতে এখানে এমন এক একটা ডিজাইন নজরে পড়ে যে তার সমতুল্য লণ্ডনের 'হ্যারডস্'এও দেখা দুষ্কর। দিল্লীর মেয়েদের পোশাকের আরো একটা বৈশিষ্ট এই যে,

কিশোরী যুবতী প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। সকালে যাকে দেখে মনে হবে চল্লিশ, সন্ধ্যা সমাগমেই তিনিই নেমে আসেন একেবারে চব্বিশে, তর্ক করলেও পঁচিশের উপর বলতে সত্যি বাধো বাধো লাগে। পোশাকের ক্ষেত্রে অবশ্য দিল্লীর ছাত্রীদের আবেদন অনবদ্য। বিশ্বাস করুন, ক' বছর আগে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈকা ছাত্রী মারাত্মক এমন পোশাক পরে ক্লাশে এসেছিলেন যে, একটি ছাত্রের (স্বাভাবিকভাবেই) নিদারুণ চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ঘটনাটি এমনি গুরুতর আকার ধারণ করে যে ভাইস চ্যান্সেলার থেকে এবং প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত মাথা ঘামাতে হয়।

আমার বক্তব্য যে অতিশয়োক্তি নয়, তার প্রমাণ ইদানিংকালে হিন্দী ও অন্যান্য ফিল্মে সালোয়ার কামিজের অধিকতর চলই প্রমান করে। বাংলার ডাইরেক্টর, মাদ্রাজের 'ডানসার' আর দিল্লী-পাঞ্জাবের সালোর-কামিজই তো আজকে বোম্বে ফিল্মের বক্স-অফিস বাঁচিয়ে রাখছে। তাই নয় কি!

কলকাতা, বোম্বে বা মাদ্রাজের সঙ্গে দিল্লীর কোন 'সোস্যাল বেস' নেই। পাঞ্জাবী প্রাধান্য হলেও, চারিদিকের লোকজন নিয়েই দিল্লী। তাইতো এখানে সবাই কেমন যেন একটা নতুন সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করেন। মান্দ্রাজবাসী মাদ্রাজী ব্রাহ্মণের যে ছেলেটি ব্যাঙ্গালোরে বসেও এক গেলাস 'বিয়ার' খেতে সাহস পাবে না. সেই-ই দিল্লীতে এসে প্রকাশ্যে হুইস্কীর বোতল নিয়ে ঘুরতে দ্বিধা করে না। তেমনি আমাদের যে সব বাঙ্গালী মেয়েদের দল এক হাত ঘোমটা না দিয়ে বাংলাদেশে পাড়ায় বেরুতে পারে না তাঁদের অনেকেই দিল্লীর আবহাওয়ায় ঠোঁটে-মুখে রং লাগিয়ে হাতকাটা পেটকাটা ব্লাউজ পরে প্রকাশ্যে দিবালোকে জনপথের স্টলে অন্তর্বাস কিনতে দ্বিধা করেন না।

ধর্মক্ষেত্রে সম্পর্কে স্থান-মাহাত্ম্যের কথা শোনা যায়। কিন্তু ধর্মক্ষেত্র না হলেও দিল্লীর একটা স্থানমাহাত্ম্য আছে! তা না হলে

(গত লোকসভায়) বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের বয়স্কা মহিলা এম-পি'কে চোখে কাজল আর মাথায় ফুল গুঁজে আসতে দেখতাম না। বলা বাহুল্য বাংলাদেশে এঁকে গরদের শাড়ী পরে মিটিং'এ আসতে দেখা যায়। পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলের আড্ডাখানায় এঁকে অনেকেই 'শকুন্তলা' আখ্যা দিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা বলতেন, 'বনলতা সেন'!

দিল্লীর ললিতা সখীদের নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর তিথিডোরের চাইতে মোটা বই লেখা যায়। কিন্তু মাত্র আর একটি 'পয়েন্ট' বলেই আকাশবাণীর ভাষায় আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব। রাজধানীর ট্রাফিক এ্যাক্সিডেন্টের হিসেব-নিকেশ খুঁটিয়ে দেখা গিয়েছে যে, মেয়েদের অতি আধুনিক গ্র পোশাক ও সেদিকে ড্রাইভারদেব সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত বহু এ্যাক্সিডেন্টের কাবণ। দিল্লীর মেয়েদের পোশাকেব জন্য মানসিক এ্যাক্সিডেন্টও বোধকরি কম হয় না।

সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ!

সতের

ছেলে-মেয়েরা আড্ডা দিলে বাপ-মা রাগ করেন ক্ষেত্রবিশেষে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' করতেও কার্পণ্য করেন না। ডক্টর নীহার রায়ের পঁচিশ টাকার 'বাঙ্গালী ইতিহাস' না পড়েও বাঙালীর ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের সামান্যতম পবিচয় আছে, তাঁরা জানেন ঊনবিংশ শতাব্দী বা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালীর জাতীয় জীবনে যে "ভিক্টোরিয়ান এজ" এসেছিল, তার অনেক খানিই আড্ডাখানার দৌলতে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর আড্ডাখানায় যে কবিতা, গান ও আলোচনা হতো, তা বাংলা সাহিত্যের ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয় বড়াল, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, নবীন সেন বাঙালীর আড্ডাখানার ঐতিহ্যকে স্ব স্ব আবেদনে ধন্য করেছেন। ভুললে চলবে

না পাইকপাড়ার আড্ডাখানায় মাইকেলের সাহিত্য পরিবেশনের কাহিনী।

পুরানো দিনের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ইদানিংকালে মুড়ি তেলেভাজা, আর মাটির ভাঁড়ের চা খেয়ে কল্লোলযুগের সাহিত্যিকদের আড্ডাখানায় কম সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। তখন বাংলার দিকপাল চিন্তানায়করা বাংলার সাংবাদিক-জগতকে আলোকিত করে রেখেছিলেন। এঁদের আড্ডাখানার পটভূমিকায় বাঙ্গালীর রাজনৈতিক জীবনের এক বিরাট ইতিহাস গড়ে উঠেছিল।

দিল্লী এসে যা পেয়েছি, তার তুলনা হয় না; যা হাবিয়েছি, তাও অমূল্য! রক্তের মধ্যে আড্ডার নেশা। কিন্তু পার্লামেন্টকে কেন্দ্র করে যে সব বাঙালী নজরে পড়ে তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেই এই নেশা বিশেষ দেখি না। বাংলাদেশের কিছু কিছু এম-পি আছেন যাঁদের কথা আলোচনা করলে অনেক অপ্রিয় সত্য বলতে হবে। কারণ কেউ বাড়িতে সজনে ডাঁটার চাষ করতে ব্যস্ত; আর কেউবা একটি বক্তৃতা দিয়ে তিনটে কপি টাইপ করে খবরের কাগজের দপ্তরে দপ্তরে পৌঁছে দিয়েই হাঁপিয়ে পড়েন। এঁদের বাড়ীতে আড্ডা হয় না বা হবারও কোনও আকর্ষণ বা কারণ নেই। আসাম, বিহার উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব প্রভৃতি সব প্রদেশের মিনিস্টার, এম-পি ও করস্পনডেন্টদের এক একটা আড্ডাখানা থাকলেও দিল্লীতে বাঙালীর সে রকম আড্ডাখানা নেই। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। দিল্লীতে বাংলাদেশের নিজস্ব 'লবী' না থাকার জন্য যে কি ক্ষতি হচ্ছে তা বাইরের লোককে বোঝান কঠিন।

তবে হ্যাঁ আড্ডা হয়; নিয়মিত নয়, অনিয়মিত। অতুল্যদা দিল্লী এলে আড্ডা বসে উনিশ নম্বর ক্যানিং লেনে। অতুল্যদার অবর্তমানে সে বাড়ী খাঁ খাঁ করে, সে বাড়ী হঠাৎ অগণিত মানুষের আগমনে হয়ে ওঠে চঞ্চল। এ বাড়ীতে আসেন না এমন কোন লোক নেই, আলোচনা হয় না এমন বিষয় নেই। লনে বসে কামরাজ নাদার, হরেকৃষ্ণ মহাতাব, নিত্যানন্দ কানুনগো, রাজা গোপালন ও বাংলা-

দেশের একদল মিনিস্টার-এম-পি মিলে আলোচনা চলছে। একটু নজর দিলে দেখা যাবে পাঞ্জাবের গ্রুপ পলিটিক্সে অতুল্যদার সাপোর্ট পাবার জন্য গুরুমুখ সিং মুসাফীর একদল লোক নিয়ে গেটের বাহিরে ঘোরাফেরা করছেন।…পরের দিন সকালে মোরারজীর বাড়ীতে অতুল্যদার লাঞ্চের নেমন্তন্ন। ভূতের মুখে খবর পেয়ে রাত দশটায় ঠিক দেখতে পাবেন একদল স্বর্ণশিল্পী উনিশ নম্বর ক্যানিং লেনে হাজির।

সাধারণতঃ বিকেলে লনে কিছু মিনিস্টার, কিছু এম-পি আর একদল প্রেস করস্পনডেন্টদের নিয়ে অতুল্যদা দরবার বসান। আলোচনার কোন বাধানিষেধ নেই এখানে। তাই হঠাৎ উঠে পড়ে ইদানিংকালে কর্পোরেশনের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা। "লোকে বলে এটা নাকি আপনার সঙ্গে প্রফুল্লদার ।"

—ওসব রাখো বাপু। এক মার পেটের ছেলের মধ্যেও ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন হয়। গান্ধীজীর সঙ্গে পণ্ডিতজীর মতবিরোধ হয়নি? প্রফুল্লদার সঙ্গে আমরাও কত বিষয়ে ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন হয়। কিন্তু তার মানেই দু'জনের মধ্যে লড়াই নয়।…চুরুটে টান মেরে আবার বলেন, খবরের কাগজগুলো কি করবে বল! হাতের কাছে কিছু নেই তো লাগাও অতুল্য ঘোষ-প্রফুল্ল সেনের লড়াই। রিপোর্টারগুলোর তো কিছু লিখতেই হবে!

কোনদিন হয়ত আমাদের কিছু মিনিস্টার-ডেপুটি মিনিস্টারের সঙ্গে চলে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রবলেম নিয়ে আলোচনা। আবার কোনদিন হয় পিওর প্রেস সেসন।

সব আড্ডা মাটি হয়ে যায় সেদিন বিজুদা (পটনায়ক) আসেন। দুজনে লাঞ্চ সেরে একটু বিশ্রামের জন্য ভিতরের বারান্দায় বসেছেন। বিজুদার প্লেয়ার্স আর অতুল্যদার চুরুটের টান চলে সমান তালে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গিয়ে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা ঘুরে রাত্রি হয়; কিন্তু দুজনের ফিসফিস আর শেষ হয় না। মাঝে মাঝে শুধু অতুল্যদার চীৎকার শোনা যাবে, হীরা, একঠো চুরুট দে যাও।

এদিকে ডাইনিং টেবিলের চারিদিক ঘিরে বসি আমরা। অতুল্যদার অবর্তমানে আমাদের লোয়ার হাউসের আলোচনায় পূর্ণেন্দুদা (নস্কর) হিবো।···জান ভায়া টি-টি-কে বলেছিল ম্যান ইটার্স আর অল এ্যারাউণ্ড এবং তারাই আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।··· বিগ বিজনেসের খেল আমবা বেশ ভালভাবেই জানি স্যার। দিল্লীতে তো আর কম দিন হলো না। দেখতে দেখতে বারো বছর কেটে গেল। কি বলুন তুগারদা?

—তা তো বটেই ভায়া।

বন্যার জলেব মত আলোচনায় এসে পড়ে বেশী বয়সে বিয়ে কবার মাহাত্ম্য। প্রখ্যাত ব্যাবিস্টাব ও এম-পি শচীন চৌধুবী এতক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে এবাব মুখ খোলেন। ·হ্যাঁ ভাই, বিয়ে দিয়েছি তুজনের। একদিন খৈতান এসে বললে উইল দেখে দিতে। দেখি সবকিছু দান কবে সংসাব ছেড়ে চলে যেতে চায়। প্রথম স্ত্রী মারা যাবাব পব ওব মন-মেজাজ একেবাবেই বিগড়ে গিয়েছিল। পরের দিন উইল নিতে এলে পবামর্শ দিলাম, খৈতান ভাই, আবাব বিয়ে কর। খৈতান তো ক্ষেপে লাল। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললাম, দেখ বাপু বুড়ো বয়সে কেউ দেখবে না, বিয়ে কব। সে আজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছব আগেকাব কথা। খৈতান বিয়ে কবেছে; কটি ছেলেমেয়েও হয়েছে। সে আজ বেশ সুখী। আর একটি বিধবাব সঙ্গে এক ইংরেজের বিয়ের কাবণ আমি। তাবাও বেশ সুখে সংসাব করছে।

এবার ইন্টাবভ্যাল। হীবা, ডালপুবী লে আও। প্লেটে প্লেটে সাজিয়ে এলো ডালপুবী আর চাটনি। খেতে খেতে কমপ্লিমেণ্ট জানাই সাপ্লায়ার তুগারদাকে।

ওদিকে ঘণ্টা আষ্টেক মাত্র আলোচনা কবে বেরিয়ে আসেন অতুল্যদা আর বিজুদা।

– কি হে, তোমাদেব কি ব্যাপার?

পূর্ণেন্দুদা আর তুগারদা সিগারেট লুকিয়ে কিছু বলার অবকাশ

পাবার আগেই হাসি হাসি মুখে এগিয়ে যান বিনয় চাটুজ্যে। 'ব্যাপার তো আজ আপনাদেরই।'

—ওহে কোন ব্যাপার নেই। এমনি খোশগল্প করছিলাম বিজুর সঙ্গে।

রেফ্রিজিরেটর থেকে প্রকাশ্যে চুরি করা সন্দেশ মুখে থাকার জন্য এতক্ষণ আমি কোন কথা বলতে পারিনি। কোনমতে গলাধঃকরণ করে বলি, ব্যাপার না মানে, আজ তো আপনারা গান্ধী-জিন্নারও রেকর্ড ব্রেক করলেন।

আড্ডা ছাড়াও উনিশ নম্বর ক্যানিং লেনের অনেক আকর্ষণ। সীতারামের আশ্রমের মত এ বাড়ীর দরজা সবার জন্য খোলা। বাংলাদেশের মিনিস্টার ও পলিটিসিয়ানদের কথা বাদ দিন। তাঁদের আসা-যাওয়া তো নিত্যই লেগে আছে। এছাড়াও হাজার ধরনের লোক আসেন। থিয়েটার পার্টি, সেতার বাজিয়ে, গাইয়ে, ছাত্র, অধ্যাপক সবাই আসেন। মাঝে মাঝে এমন লোকও দেখি যাঁরা কলকাতার ময়দানে অনেক সময় অতুল্যদার বিরুদ্ধেও বক্তৃতা দেন।

আড্ডার চাইতে আমার নজর কিন্তু ঐ রেফ্রিজিরেটরের দিকে। কলকাতায় যেমন কে. সি. দাসের রসগোল্লা, দিল্লীতে তেমনি/ ডেপুটি মিনিস্টার মনোমোহন দাশের সন্দেশ ছাড়াও জুগারদার ডালপুরী, মতিমহল ও ওয়েঙ্গারের মিট প্রিপারেশন বিখ্যাত। এসব কিছু পাবেন অতুল্যদার ঐ 'ফ্রিজটি'র মধ্যে। আমি ঘুরে ফিরে বেড়াই আর ফ্রিজ খুলে টুক-টাক মুখে পুরে চলি কিছু না কিছু। দিনগুলো নেহাতই মন্দ কাটে না, কি বলুন!

আঠার

লজ্জা ঘৃণা ভয় থাকলে যেমন তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়, তেমনি আজকের দিনে সার্থক সাংবাদিক হওয়াও অসম্ভব। শাস্ত্র বলেছে, সত্যম্ ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের মত সেদিনের শাস্ত্রকাররা একটা 'এ্যামেণ্ডমেণ্ট' জুড়ে

বলেছেন, অপ্রিয় সত্য কখনও বলবে না। কালাপাহাড় নই, তবে শাস্ত্রানুরাগীও নই। তাই শাস্ত্রের বিধান অমান্য করে কিঞ্চিৎ অপ্রিয় সত্য পরিবেশন করছি। মার্জনা করবেন।

জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিকে আগে 'রাষ্ট্রপতি' বলা হতো। সমগ্র জাতির প্রেম-ভালবাসার প্রতিমূর্তি হতেন সেদিনের 'রাষ্ট্রপতি সুভাষ' 'রাষ্ট্রপতি জওহরলাল' রাষ্ট্রপতি...। দেশ পালটেছে, কংগ্রেসও বদলেছে। কিন্তু 'প্যারা-ফার্নোলিয়া' বদলায়নি। আজও কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে উট বা গরুর গাড়ীর উপর চাপিয়ে দু'চার মাইল লম্বা প্রসেশন করে নিয়ে যাওয়া হয়। আজও তিনি তাকিয়ার উপর বসে, টোলের পণ্ডিতদের মত একটা ডেক্স সামনে রেখে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ; তলব করেন জওহরলালকে বক্তৃতা দেবার জন্য এবং হুকুম করেন মোরারজীকে প্রস্তাব সমর্থনের জন্য। আবার মাঝে মাঝে ঘণ্টা বাজিয়ে বক্তৃতা থামিয়ে দেন অনেক নামকরা নেতার। এইসব ঘটনা এমন 'সিরিয়াসলি' হয় যে সাধারণ লোকের তাক লেগে যায়। তাক লাগাই স্বাভাবিক এবং আমি তাদের দোষ দিই না। তবে হ্যাঁ, সত্যি কাহিনী বা প্রকৃত অবস্থা যদি জানতেন-তবে আপনি না হেসে পারতেন না।

ট্যাণ্ডন-নেহরু লড়াই-এর পর জওহরলাল স্বয়ং কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তাঁর কথা বাদ দিন। সত্যি বলতে তারপর আর কেউ 'রিয়েল' কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হননি।...অন্ধ্রের রাজনীতিতে উজান বাইছিলেন চীফ মিনিস্টার সঞ্জীব রেড্ডী। হায়দ্রাবাদে আর মন টিকছিল না। দিল্লীতে এলেন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হয়ে। ভেবেছিলেন ভালই কাটবে ; আফ্‌টার অল একটা অল ইণ্ডিয়া লীডার হওয়া যাবে। জওহরলাল-পন্থ-শাস্ত্রী-মোরারজীর সঙ্গে এক টেবিলে বসে পলিটিক্স করা যাবে—লোভটা নিতান্তই কম নয়। দিল্লীতে পৌঁছবার কদিনের মধ্যেই গিয়েছিলেন পন্থজী সন্দর্শনে। উদ্দেশ্য মহৎ, পলিসি ডিস্‌কাসন। 'রাষ্ট্রপতি' সঞ্জীব রেড্ডী বোধকরি আশা করেছিলেন পন্থজী স্বয়ং এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে

তুলবেন।' হায় অদৃষ্ট! জনতা এক্সপ্রেসের সঙ্গে ড্রইংরুমে বসতে হলো কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের। বেশীক্ষণ নয়, ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই তলব পড়ছিল! মিনিট দশেকের মধ্যে পলিসি ডিস্কাশন শেষে বেরিয়ে এলেন সঞ্জীব রেড্ডী।

শুনেছি কদিনের মধ্যেই সঞ্জীব রেড্ডী তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন দিল্লীতে এসে মহা ভুল করেছি।...আজ থেকে আবার হায়দ্রাবাদ ফিরে যাবার আশায় দিন গুনব। মন তাঁর টিকত না যন্তরমন্তরে; তাই ঝড়ের বেগে ঘুরে বেড়াতেন সারা ভারতবর্ষ।

সঞ্জীব রেড্ডীর হায়দ্রাবাদের রিটার্ণ টিকিটের 'কনফারমেশন' জওহরলালজীর কাছ থেকে পাবার পর সে আর এক মহা সমস্যা। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আর খুঁজে পাওয়া যায় না। দু'একজন সেন্ট্রাল মিনিস্টারের নাম শোনা গেল। কিন্তু তাঁরা কথাটা গায়েই লাগালেন না। পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হল লবীতে সে কি মুখর আলোচনা! দু'একজন এম-পি—মিনিস্টার প্রস্তাব করলেন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে: ওয়ান্টেড কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আর একটি সল্যুশনও সাজেস্টেড হয়েছিল: ডিফিটেড মিনিস্টার পাকড়াও করো। এই প্রসঙ্গে কেশ-বিহীন কেশকারের নাম বহুবার শোনা গিয়েছিল।

ম্যাজিক দেখেছেন নিশ্চয়ই। মনে করে দেখুন ম্যাজিসিয়ান দেখিয়ে দিলেন তাঁর হাত খালি; অথচ একটা তুড়ি মারতেই হাতের মধ্যে টাকা-পয়সা এমন কি মুরগীর বাচ্চা দেখান ম্যাজিসিয়ান। জওহরলাল তেমনি; এক তুড়ি মেরে খালি হাতের মধ্যে দেখিয়ে দিলেন নতুন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট। বিশ্বাস করুন প্রায় ম্যাজিসিয়ানের মতই এ কাজ করেছিলেন জওহরলাল। সপ্রু হাউসে এ-আই-সি-সি সেশন আরম্ভ হয়ে গেছে—তখনও পর্যন্ত কেউ জানেন না। পরের দিন একেবারে গলায় মালা চাপিয়ে পরিচয় করে দিলেন নতুন কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে; মনে করে দেখুন অধুনাকালের বিখ্যাত ডেবর ভাই'এর বেলাতেও এমনি ম্যাজিক দেখিয়ে ছিলেন জওহরলাল।

কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া হয় না; কিন্তু জহরলালের দস্তখত-করা এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিলে অন্যায় হবে না, বরং সত্যতার স্বীকৃত জানানো হবে।

কংগ্রেস জেনারেল সেক্রেটারীদের অবস্থা আজকাল আরও শোচনীয়। শাস্ত্রীজির বাড়ীর তাঁবুতে বসে আছি। টেলিফোন এলো: হা ভাই দিস্ ইজ কে. কে. শা; শাস্ত্রীজির সঙ্গে কখন দেখা হতে পারে। পার্সোনাল এ্যাসিস্টেন্ট নির্বিকারচিত্তে জানিয়ে দিলেন, মিনিস্টার্র আভি ঘর মে নেই স্যার; বাড়ী ফিরলে জিজ্ঞেস করে খবর দেব। শাস্ত্রীজি কিন্তু বাড়ীতেই আছেন এবং আগত লোকজনের সঙ্গে দেখাশুনাও করছেন।

দিল্লীর বাইরে এঁদের অন্য চেহারা। কখনও কেরালা ভাঙ্গেন· আর কখনও বা মিলিটারী স্ট্রাটেজী নিয়ে গৌহাটিতে জোর প্রেস কনফারেন্স করেন। যন্তর-মন্তরে বসে স্টেনসিল পেপারে লোহার কলম দিয়ে দস্তখত করা ছাড়া আপাতত এঁদের কোন কাজ নেই বোধ হয়।

শ্রীমন নারায়ণই বোধহয় শেষ বুদ্ধিমান কংগ্রেস জেনারেল সেক্রেটারী। আগরওয়াল উপাধি আর জেনারেল সেক্রেটারীশিপ ত্যাগ করে প্ল্যানিং কমিশনে হাজার তিনেকের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। লোকে বলে, সাদিক ভাই'এরও এমনি বাসনা ছিল; কিন্তু প্ল্যানিং কমিশনে তো নো ভ্যাকান্সী'।

উনিশ

সতী সাবিত্রী-খনা-লীলাবতী-সীতা-অরুন্ধতীর দেশ ভারতবর্ষে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে স্বামী-বন্দনার কাহিনী বিধবা ঠাকুমা-পিসিমার দৌলতে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। ছোটবেলায় মা'কে হারিয়ে পিতৃ-বন্দনা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে আশে পাশে স্বামীর কল্যাণকামনায় পুজা-পার্বন-ব্রতপালন কম দেখিনি। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বহু রীতি-নীতির মত স্বামী-কল্যাণ যজ্ঞেরও

পরিবর্তন হয়। তাইতো রাজধানী দিল্লীতেও স্বামী-কল্যাণ যজ্ঞের এক নতুন রূপ আছে।

ড্রইংরুমের সোফায় বসে আনন্দ পাবার লোক আমি নই। আমি রান্না-ঘরের ভাতের হাঁড়ির ঢাকনা হয়েই আনন্দ পাই। তাইতো বহু পত্নীদের স্বামী-উপাসনার এক দুর্লভ ও অনন্য দৃশ্য বহু সময় দেখার বা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। চুড়িদার পায়জামা, শেরোয়ানী ও ধব্‌ধবে আন্‌কোরা গান্ধী-টুপি চড়িয়ে মন্ত্রীরা বক্তৃতা করেন, হাততালি পান, খবরের কাগজের পাতায় পাতায় নাম ছাপান। মধুকুঞ্জের মত তাঁর চারপাশে ঘুরেফিরে বেড়ায় হাজার জন। কিন্তু হায় অদৃষ্ট! এই এত বড় একটা কর্মকাণ্ডের পিছনে যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী—সেই মন্ত্রী-পত্নীর খবর হয়ত অনেকেই রাখেন না।

হঠাৎ বিশ্বাস করতে ইচ্ছা না করলেও এ-কথা সত্যি যে পত্নীর পুণ্যে বহু রাজনৈতিক জীবনের মোক্ষ-লাভ করে মন্ত্রিত্ব পান। থার্ড জেনারেল ইলেকশন শেষ হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই নতুন মন্ত্রিসভা হবে হবে—ঠিক এমনি সময়কার কথা বলছি। দুঃসংবাদ হাওয়ায় ভেসে আসে বলে একটা চলতি কথা আছে। এমনিভাবে হাওয়ায় ভেসে এক মহা দুঃসংবাদ এলো বিদায়ী মন্ত্রিসভার একজনের কাছে। বাতাস যেন তাঁর কানে কানে বলে গেল, এবার আর চান্স নেই। স্বর্গ থেকে আসন্ন বিদায়ের সম্ভাবনায় সারা বাড়ীতে যেন শোকাচ্ছায়া পড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর রংটাই বোধকরি পাল্টে গেল। দুঃসংবাদ কি আর মিথ্যে হয়! শুনেছি, ক'দিনের মধ্যে স্বয়ং লালবাহাদুর সে বাড়িতে হাজির হয়ে গুজবের সত্যতা জানিয়েছিলেন। তিনি নাকি অনেক করে সান্ত্বনাও দিয়েছিলেন দুঃখ না করার জন্য। শোকাতুর অবোধ মন কি যুক্তি মানে! মন্ত্রী-পত্নী হাউ হাউ করে কেঁদেই ফেলেছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি হাল ছাড়লেন না। কাঁছা-আঁটা বারো হাত শাড়ী পরে পরের দিন হাজির হলেন এক নম্বর ইয়র্ক প্লেসে। আবেদন-

নিবেদন দাবী জানিয়ে ফিরে এলেন মন্ত্রী-পত্নী। কিছুদিন পরে রাষ্ট্রপতি ভবন সার্কুলারে তাঁর স্বামীর নাম অপ্রত্যাশিতভাবে আবার দেখা গেল! কিন্তু আমার দুঃখ এই যে, দিল্লীর রাজনৈতিক জগতের এমন বেহুলার কাহিনী কেউ জানল না!

এ আর এক বীরাঙ্গনার কাহিনী। ঠিক একই সময়ের কথা। হঠাৎ দিল্লীর বাজারে গুজব চালু হয়ে গেল, উনি আর মন্ত্রী হচ্ছেন না। তবে মন্ত্রীত্বের রিটায়ারমেণ্ট বেনিফিট হিসেবে গভর্ণর হবেন। ভদ্রলোক ভালভাবেই জানতেন গভর্ণর হওয়া মানেই 'পলিটিক্যাল কেরিয়ার'-এর বারোটা বেজে যাবে। তাই যেভাবেই হোক মন্ত্রী থাকতেই হবে। কিন্তু থাকতে হবে বললেই কি আর থাকা যায়? আর তা-ছাড়া 'হু উইল বেল দি ক্যাট'—নেহরুকে বলা যায় কিভাবে! লোকে বলে পত্নীর দৌলতে ইনিও সেবার রক্ষা পেয়েছিলেন।

কড়া মন্ত্রী-পত্নী হিসেবে আলোচ্য মহিলার অশেষ সুনাম। বাজারে মাছের দাম কোনদিন তিন টাকা, কোনদিন বা সাড়ে তিন টাকা। কিন্তু সে-কথা বলার সাহস চাপরাশী-বেয়ারাদের নেই। নিজের গাঁট থেকে পয়সা দিয়ে মন্ত্রী-পত্নীকে হিসেব দিতে হবে, দশ আনা পোওয়া। স্বামী নেহরুর সুনজরে আছেন। কিন্তু তাই বলে কি ইলেকশনের পর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যায়। তাঁর সেই চির-পরিচিত অপ্রয়োজনীয় কালচারাল ইনস্টিটিউশনের ধুয়া ধরে নাকি রাধাকৃষ্ণনের কাছে বার বার যাতায়াত শুরু করলেন।

কলেরা-বসন্ত যে সবারই হবে, তার কোন মানে নেই, তবে টিকা ইনজেকশন নেওয়া থাকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা যায়। দুষ্টু লোকে বলে মন্ত্রী-পত্নীর ঘোরাঘুরিও টিকা-ইনজেকশনের মত অপ্রত্যাশিত বিপদ্ এড়াবার প্রচেষ্টা বই আর কিছু ছিল না।

এমনি বহু কাহিনী রাজধানীতে ঘটে থাকে। এইত ক'দিন আগেকার কথা বলছি। আমাদের ধোলা-থাগ্‌লা দৌলতবেগ ওলডির পতন ঘটেছে। বিশে-বাইশে অক্টোবরের কথা বলছি। কৃষ্ণ

মেননের অবস্থা যখন বিশেষ উৎকণ্ঠাজনক। এদিকে মোরারজী নেশন-ওয়াইড ব্রডকাস্ট করে সোনা চাইলেন জনে-জনের কাছে।

এঁরই দু'একদিনের মধ্যে এক নম্বর উইলিংডন ক্রীসেণ্টে গেছি মোরারজী সন্দর্শনে। জীবনে সোনা প্রায় দেখিনি বললেই চলে, তাই এখানে এসে সোনা দানের হিড়িক দেখে আমার চোখ তো ছানাবড়া। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে আমার এক পাতা-কাটা বৌদিকে দেখে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি নি। দেখলাম, আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন, দুটি মোটা মোটা কঙ্কন খুলে দিলেন। আমার দাদাটি কৃষ্ণমেননের কৃপায় দিল্লীর মসনদে ঠাঁই পেয়েছিলেন, এ কথা সবাই জানেন। কথায় বলে, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। তাইতো দাদা যেই দেখেছেন, কৃষ্ণ মেনন পড়ো পড়ো, অমনি কঙ্কন দিতে বৌদিকে পাঠিয়েছেন উইলিংডন ক্রীসেণ্ট মোরারজী গৃহে।

কুড়ি

উনিশ শ' ছত্রিশের জুনে দার্জিলিং জেলে বন্দী ছিলেন সুভাষচন্দ্র, সেখান থেকে এলাহাবাদে জওহরলালকে লিখেছেন গর্ডন ইস্টের হিস্টোরিক্যাল জিওগ্রাফী অফ্ ইউরোপ, পিট রিভার্সের ক্ল্যার্শ অফ্ কালচার্স এণ্ড কনট্যাকট অফ রেসেস, স্পেণ্ডারের শর্ট হিস্ট্রি অফ আওয়ার টাইমস, আর পি, দত্তের ওয়ার্লড পলিটিক্স (১৯১৮-৩৫), হ্যালডেনের সায়েন্স এণ্ড দি ফিউচার, হাক্সলের আফ্রিকা ভিউ, রালফ ফক্সের চেঙ্গিস খাঁ ও বার্ণেসের দি ডিউটি অফ এম্পায়ার তাঁকে পাঠিয়ে দিতে। 'দি গোল্ডেন থে্শহোল্ড,' হায়দ্রাবাদ থেকে চিঠি এলো, ভাই জওহর, তোমার জন্য ক'খানা বই রেখেছি। কিন্তু পাঠাতে ভয় হয়, কারণ যখনই তোমাকে কোন বই পাঠাই, প্রায় দেখি তার অনেকগুলোই তুমি আগে পড়ে ফেলেছ। তাই আগে থেকে লিখছি···যেগুলো তোমার পড়া নেই জানালে পাঠিয়ে দেব।···"লাভ ফ্রম লাভিং-সিস্টার সরোজনী"।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেই দিনগুলিতে হাজার রকমের সমস্যার

সম্মুখীন হতেন নেতৃবৃন্দ ; সমাধান নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদও কম হতো না। বহু পলিসি ম্যাটারে তীব্র মতভেদ থাকা সত্ত্বেও জওহরলালের কাছে বই চাইতে দ্বিধা করতেন না সুভাষচন্দ্র ; আবার ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান বা লণ্ডন টাইমস"এ কোন ভাল প্রবন্ধ নজরে পড়ছে, সুভাষের কাছে তার ক্লিপিংটা পাঠাতে ভুলতেন না জওহরলাল।···একসঙ্গে শুধু রাজনীতিই করতেন না সরোজিনী নাইডু আর তাঁর ভাই 'জওহর', বই-পত্রও পড়তেন মিলিতভাবে।··· চরম রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে দেশ, দীর্ঘ বাদানুবাদের পর নেহরু-জিন্না মোলাকাত হলো। শুনেছি, তার মধ্যে ওঁরা নাকি মাঝে মাঝে সাহিত্য-আলোচনা করতেন!

আর আজ! দিল্লীতে নেতার অভাব নেই, কিন্তু পড়ুয়া নেতার বড় অভাব। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের কথা বাদ দিন। তিনি এত বই একসঙ্গে পড়েন যে, টেবিলে বসে পড়তে পারেন না। তাইতো বিছানায় বসে পিঠে বালিশ দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে শতখানেক বই আর পত্র-পত্রিকা নিয়ে তাঁকে দেখা যায় সব সময়। নেহরু তো সময়ই পান না। তবু রাত্রে শুতে যাবার আগে কিছু সময় বইপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া না কবলে এখনও তিনি ঘুমোতে পারেন না। এক্সটাবন্যাল এ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি ও পার্লামেণ্ট হাউসের তাঁর খাস কামরায় অবশ্য সর্বদাই কিছু বই-এর ইমার্জেন্সী স্টক থাকে। যদি দুর্ঘটনাক্রমে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ফুরসত এসে যায় তবে কোন না কোন বই এর দু'-একটা চ্যাপটার নিশ্চয়ই শেষ করবেন।

অনেক কর্তার বাড়ীই তো ঘুরি, কিন্তু বইপত্র বিশেষ নজরে পড়ে না। তবে হ্যাঁ, ড্রইং বা ভিজিটার্স রুম ডেকোরেট করার মত কিছু বই আর পত্রপত্রিকা সব বাড়ীতেই নজরে পড়বে। প্ল্যানিং কমিশনের কিছু অখাদ্য রিপোর্ট, অস্পৃশ্য কিছু সরকারী পত্রপত্রিকা এবং 'উইথ বেস্ট কমপ্লিমেণ্ট ফ্রম পাবলিকেশন ডিভিশন'ই এখানে নজরে পড়ে। দু'-একজন মন্ত্রীর বাড়ীতে বিরাট কাঁচের আলমারিতে জাপানী প্রথায় ধান চাষের প্রচার-পুস্তিকা বা অনুরূপ

কোন 'ক্ল্যাসিক' দেখা যাবে। হাক্সলে, রাসেল গর্ডন ইস্ট, আনল্ডি টয়েনবি বা রবীন্দ্রনাথের এখানে প্রবেশ নিষেধ। আধ শ' মিনিস্টার আর শ' পাঁচেক কংগ্রেস এম-পি'র বাড়ী ঘুরে পাঁচ কপি গান্ধীর "মাই এক্সপেরিমেণ্ট উইথ ট্রুথ" পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বিপ্লবী বামপন্থী নেতৃবৃন্দের বাড়ী প্রচার-পুস্তিকা দেখবেন অনেক, কিন্তু 'দাস ফার' নো ফারদার'।

দিল্লীর অক্সফোর্ড বুক শপের এক প্রবীণ কর্মচারী একবার আমাকে জানিয়েছিলেন যে আগেকার নেতাদের মধ্যে জিন্না নিয়মিত ওঁদের দোকানে আসতেন। জিন্না কখনও সেলস্ম্যানের সাহায্য নিতেন না, নিজেই দেখেশুনে বই বেছে নিতেন। ইদানিংকালে কৃষ্ণ মেননও তথৈবচ। কোন সেলস্ম্যানের ধার ধারেন না তিনিও; ঝড়ের বেগে দোকানে ঢুকে মুহূর্তের মধ্যে কয়েক ডজন বই বগলে নিয়ে উধাও হন। আর হ্যাঁ, সব চাইতে 'হেভী' বিল হয় ডাঃ সম্পূর্ণানন্দের।

শুনেছি লেটেস্ট পাবলিকেশন করে ভারতে আসবে তার অপেক্ষা সহ্য করতে পারেন না নেহরু; বই বেরুবামাত্র লণ্ডন-নিউইয়র্ক-প্যারিস থেকে আনিয়ে নেন।

নেতাদের মধ্যে বই-এর নেশা খুব বেশীজনের নেই। রাধাকৃষ্ণণ-নেহরু-কৃষ্ণ মেনন ছাড়া বোধকরি হুমায়ুন কবির সাহেবেরই ভাল ক'লেকশন আছে। মাঝে মাঝে জনপথ—কনট প্লেসের বুকস্টলে কিছু কিছু আধ সেরী বা তিন পোয়া মন্ত্রীদের দেখা যায়; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগাথা ক্রিস্টি বা তাঁর সমগোত্রীয়ের মধ্যেই এঁদের ঘোরাফেরা। দু'-একজন রসিক মন্ত্রী যে নেই তা নয়।···

চারিদিকে ঝড়-বৃষ্টিতে সব ভেঙেচুরে পড়ছে, যুবতী-স্বরূপ প্রকৃতিদেবীর আঁটসাট বেশভূষা খসে পড়ছে···ঘরে বসে কম্পানী ল'র ফাইলপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে মন চাইছে না মন্ত্রী নিত্যানন্দ কানুনগো সাহেবের।

—'হ্যালো, আমি মামাবাবু কথা বলছি, তোমার কাছে বৈষ্ণব পদাবলী আছে ?'

—'কি ব্যাপার মামা' আজ হঠাৎ বৈষ্ণব পদাবলীর স্মরণ।'

…'এমন সুন্দর ঝড়-বৃষ্টি আর বিদ্যুতের খেলার মধ্যে ফাইল ধরতে মন চাইছে না। তাই ভাবছিলাম ঝড়ের রাত্রে বিরহ-কাতরা রাধার ছুটাছুটির বর্ণনাটা একটু পড়তাম।'

—'এ্যাট ইওর সার্ভিস মামা।' কিন্তু দুষ্টুমি করতেন মন্ত্রী নস্কর সাহেব: 'হঠাৎ এমন বিরহকাতরা রাধার তলব ?'

'—মাই বয়, বিহেভ লাইফ এ বয়।'

মিথ্যে বলব না, খবরের কাগজের পাতায় নিজেদের নাম বেরিয়েছে কিনা, তা অনেকেই খুঁটিয়ে পড়েন।…আমেরিকায় নায়েগ্রা জলপ্রপাতের পাশে একটা ছাপাখানা আছে; সেখান থেকে 'নায়েগ্রা টাইমস' নামে এক পত্রিকা (?) প্রকাশিত হয়। দশ-পনের ডলার দিলেই সে কাগজে মোটা মোটা অক্ষরে ছাপান যায় "মিঃ ওমুক দাস ভিজিটেড নায়েগ্রা ফলস: লিডিং ইণ্ডিয়ান চার্মড বাই সিনিক বিউটি …।" এব পর থেকে "মিঃ ওমুক দাস এক এক্স-ক্লুসিভ্ ইন্টারভিউতে বলেন…।" ইত্যাদি ইত্যাদি। মিনিট পনের-কুড়ির মধ্যেই কাগজ ছাপিয়ে শতখানেক কাগজের একটা বাণ্ডিল লাল ফিতায় বেঁধে দিয়ে দেওয়া হয় মিঃ ওমুক দাস বা অনুরূপ দশ-পনের ডলারের মহাপুরুষদের হাতে। অতঃপর ছাতু খানসামা লেনে ফিরে এসে ঐ কাগজের কপি দেখিয়ে ভজহরি ব্যায়াম সমিতির সভাপতি হয় মিঃ ওমুক দাস। শুনেছি, দিল্লীতেও এম-পি'দের জন্য অনুরূপ একটা কাগজ আছে! অর্থ-সর্বস্ব এম-পি'দের দল নাকি সে কাগজে নিজের বক্তৃতা ছাপিয়ে তার কপি হরির লুঠের বাতাসার মত ছড়িয়ে দেন নিজেদের নির্বাচন কেন্দ্রে! হাজার হোক দেশ-সেবার কিছু রেকর্ড তো জনসাধারণকে দেখাতে হবে! তাই বলি, পড়ার বাতিক না থাকলে কি হয়, নিজেদের বিষয়ে অপরকে পড়াবার বাতিক দিল্লীতে বেশ নজরে পড়বে।

একুশ

লাল তিব্বা থেকে ফিরেছিলাম মুসৌরী; ক্লান্ত হয়ে পথে শেয়ারে চড়েছিলাম ছেদীলালের ট্যাক্সি। কেন জানি না, ছেদীলালের সঙ্গে ভাব জন্মেছিল বেশ। পর পর ক'দিন ওরই ট্যাক্সি চড়ে হ্যাপি ভ্যালী ক্লাব-স্যাভয়-ল্যানডোর পাহাড়ের এদিক-ওদিক ঘুরেছিলাম। মুসৌরী ত্যাগের পূর্ব-সন্ধ্যায় নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলাম ছেদীলালের শহরতলীর বাড়ীতে।

আমার সম্মানে ছেদীলাল যে ক'জন বিশিষ্ট অতিথিকে নৈশভোজনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল সুরেন্দর। বাঙালী বলে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল সুরেন্দর। 'জয় হিন্দ' বলে আসন নিয়েছিল আমার পাশে।

লুধিয়ানার এক সামান্য কৃষক পরিবারে সুরেন্দর পালের জন্ম। গ্রামের স্কুলে পড়তে পড়তে কোনরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে ম্যাট্রিক ক্লাশ অবধি উঠেছিল, কিন্তু পাশ করেনি। তারপর এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বাপ-মাকে প্রণাম আর ইউনিয়ন-জ্যাককে সেলাম করে সুরেন্দর ভর্তি হলো ব্রিটিশ আর্মির এক ইনফ্যান্টি রেজিমেন্টে। তারপর। তারপর ডাক পড়ল ইম্ফল, মণিপুর, বার্মার সীমান্তে। এর পরের কাহিনী বলতে বলতে সুরেন্দর উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মুখের গ্রাস নামিয়ে রাখে, চোখে-মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। আমার হাতটা চেপে ধরে সুরেন্দর।

'সাব কি বলব, বর্মার জঙ্গলে মহাপুরুষের দর্শন পেলাম। গভীর রাত্রে সূর্যোদয়ের মত তিনি আমাদের মাঝে হাজির হলেন।··· 'জয় হিন্দ' বলে সেলাম মেরে নিজের নিজের সঙ্গীন নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা সবাই।' এইটুকু বলেই হো হো করে হেসে ওঠে সুরেন্দর। 'বাবুজী, জান বাবুজী, নেতাজী এসেছেন শুনে শাদা চামড়ার সাহেবদের সে কি ভয়! পড়ি-মরি করে দৌড়েছিল সব।"

ছেদীলাল আর সুরেন্দরের সঙ্গে যখন গল্প শেষ হল তখন ঘড়িতে দেখি রাত বারোটা পাঁচ। উঠে দাঁড়াতেই ছেদীলালের স্ত্রী-পুত্র প্রণাম করল আমাকে। চক্ষুলজ্জাহীন বড়লোকদের মত দুটো টাকা বকশিশ দিয়ে এদের প্রাণের মানুষটির অপমান করতে চাইল না আমার মন। হাত ধরে শুধু বলেছিলাম বহিনজী, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। মনে মনে বোধহয় আরো কিছু বলেছিলাম, ঠিক মনে নেই। ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়েছিলাম। 'চাচ'জী ফির আনা'; আর আমাকে মনে থাকবে?

—না বাবা, তোমাকে ভুলব না। আমি বোধহয় সবকিছু পারি, পারি না শুধু অতীত স্মৃতিকে মুছে ফেলতে।

অনেক রাত্রে ছেদীলালের সঙ্গে ফিরে এলাম হোটেলে। আড় চোখে চেয়ে দেখেছিলাম রিসেপশন কাউন্টারের কর্মচারীরা মুচকি হাসছিল। বোধকরি সন্দেহ করছিল মুসৌরী ত্যাগের পূর্বরাত্রিতে এই ড্রাইভার সমভিব্যাহারে পার্বত্য প্রদেশের কোন বিশেষ সৌন্দর্য উপভোগ করতে গিয়েছিলাম।

সূর্যোদয়ের বেশ আগেই বেরিয়ে পড়লাম মুসৌরী থেকে। ডেরাডুনে ওয়েস্টার্ণ ব্রেকফাস্ট আর মীরাটে ভোজপুরী বামুনের পুরী-ভাজী খেয়ে যখন দিল্লী ফিরলাম, তখন দিনের আলো প্রায় শেষ।

লোকে বলে দশচক্রে ভগবান ভূত। দিল্লীতে ফিরে আমার তাই হলো। কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝে ছেদীলাল-সুরেন্দরকে প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। কখনও কখনও অলস মধ্যাহ্নে হয়ত বা মনে হতো, কিন্তু কর্মস্রোতে তাদের ছবি মনের পর্দায় আবছা হয়ে উঠত।

একদিন অপরাহ্ন বেলায় এক বন্ধুসন্দর্শনে গিয়েছিলাম নিরুলা হোটেলে। গেট থেকে বেরিয়ে ফুটপাতে পা দিয়ে এদিক-ওদিক দেখছি, এমন সময় হঠাৎ এসে কে যেন আমাকে জড়িয়ে ধরল। হতভম্ব হয়েছিলাম এমন আকস্মিক আলিঙ্গনে।

'জয় হিন্দ' সাব, খবর সব আচ্ছা হ্যায়?

এতক্ষণে সম্বিত ফিরে এলো। দেখি, সুরেন্দর। ভূতপূর্ব আজাদ হিন্দ ফৌজের সেপাই সুরেন্দর পাল আজ দিল্লীর ট্যাক্সি ড্রাইভার।

কারণে-অকারণে সুরেন্দরের ট্যাক্সিতে আমাকে চড়তে হয় সেই থেকে। শান্তিপথ বা মথুরা রোড দিয়ে চলেছে ট্যাক্সি, হঠাৎ থামিয়ে দেয় সুরেন্দর।···সাব, দিল নেই লাগতা ট্যাক্সি চালানে মে; আগার নেতাজী মজুত হোতা থা তো···।' আর বলতে পারে না সুরেন্দর। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, চোখের কোণে দেখি জল। নেতাজী আজ ওদের মাঝে নেই, একথা ভাবতেই পারে না সুরেন্দর। 'ষ্টিয়ারিং'এর উপর কনুই রেখে উদাস হয়ে কি যেন ভাবে সুরেন্দর। আমারও মুখে কোন কথা আসে না, হাঁ করে চেয়ে থাকি মুখের দিকে। দেখতে পাই, ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে সুরেন্দরের মুখ বেয়ে।

'দুঃখ করো না, ভাই!' মামুলি সান্ত্বনা জানাই আমি।

'সাব, দুঃখ না করে উপায় নেই! তিনি আমাদের শুধু নেতা ছিলেন না; ছিলেন সাক্ষাৎ দেবতা, আমাদের বাপ-মা। হাজার হাজার লোকের মধ্যে কারো জ্বর হয়েছে, মধ্যরাত্রে ঠিক দেখা যেত নেতাজীকে তার পাশে; কেউ যন্ত্রণায় ছটফট করছে সস্নেহ স্পর্শে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন নেতাজী। কি বলব সাব, সেপাই-হাবিলদার-কর্ণেল-মেজর জেনারেলের মধ্যে কোন বাছবিচার করতেন না; সন্তানজ্ঞানে সবাইকে স্নেহ করতেন, পরিচর্যা করতেন, আহার-বিহারের তদারক করতেন।

একটু পাশ ফিরে বসে সেপাই সুরেন্দর পাল।

'জান সাব, লরী থেকে মাল খালাস করছিলাম আমরা জন-তিনেক। তাড়াতাড়ি হঠাৎ এক পেটি ভারী মাল পড়ল আমার উপর। একটা চীৎকার করেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম আমি।···পরের দিন জ্ঞান হলো, তখন দেখি আমি সিঙ্গাপুরের বড় হাসপাতালে। চারপাশে ডাক্তার-নার্সের দল; চোখ ঘুরিয়ে দেখতে গিয়ে নজর পড়ল মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন নেতাজী। জয়

হিন্দ বলে সেলাম দিয়ে ধড়মড় করে উঠতে যেতেই আমাকে আস্তে শুইয়ে দিলেন নেতাজী। হাসপাতাল ছেড়ে ডিউটিতে জয়েন করতে চাইলাম আমি।' এবার প্রায় চীৎকার করে ওঠে স্থরেন্দর। 'জান সাব, নেতাজী কি বল্লেন?—বল্লেন, 'স্থরেন্দর, আজ তোমার বেঁচে ওঠাটাই সব চাইতে বড় কাজ। ভগবান তোমাকে সুস্থ করে দিন, তারপর সব কিছু কিছু কাজ।'

হাতটা চেপে ধরে স্থরেন্দর: 'বলো সাব, বাপ-মা ছাড়া এমন কথা আর কে বলতে পারে?'

স্থরেন্দরের ট্যাক্সি চড়ে ঘুরতে ঘুরতে আবো অনেক কাহিনী শুনি। শুনি দিল্লীতে লক্ষাধিক আজাদ হিন্দ ফৌজের লোক আছে। নেতাজীর নামে আজও তারা হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে। স্থরেন্দরকে দেখে কথাটা অবিশ্বাস করতে পারিনি।

দীর্ঘদিনের ব্যবধানের পরেও এমন ভাবে কোন দেশনেতার প্রতি আজও তাঁর সহচরদের ঠিক এই ধবনের শ্রদ্ধা আছে বলতে পারেন? নামকরা গায়ক-গায়িকাদের গান আর ফিল্ম-স্টারদের আবৃত্তির ব্যবস্থা না থাকলে কোন মহাপুরুষের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বক্তা ছাড়া শ্রোতা তো আজকাল নজরেই আসে না। তবুও এঁরাই আমাদের নেতা, এঁদের নামে সারা দেশ নাকি গদগদভাবে গলে পড়ে!

বাইশ

নাম যার রাজধানী, রাজনীতি থেকে তার মুক্তি কোথায়? কংগ্রেসের কোন্দল, পি-এস-পি-র সর্বজ্ঞপনা, কমিউনিস্টদের 'ওয়ানট্রাক মাইণ্ড', স্বতন্ত্রদের 'রাজা'-নীতি, সোস্যালিস্টদের গোঁয়ার-তুমি, জনসংঘের একগুঁয়েমি, হিন্দীওয়ালাদের কাঁদুনি, ডি-এম-কে-র হাহাকার এবং এমনি কত কি নিয়ে রাজধানী সারা বছর সরগরম থাকে। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত মাঝে মাঝে এসে পড়ে সিরাজুদ্দীন, আমরোহা-নর্থ বোম্বের ইলেকশনের ঢেউ অথবা মিনিস্টারদের লড়াই।

কিন্তু তাহলে কি হয়! রাজধানীর জীবনে বছরে দুটি-একটি দিন আসে, যখন সব লড়াই থেমে হঠাৎ যুদ্ধবিরতি হয়। এমনি এক মহালগ্ন রাজধানীতে সম্প্রতি এসেছিল 'ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড' উৎসব উপলক্ষে।

উৎসবের বেশ কিছু আগে থেকেই সরকারী আমলাতন্ত্রের চাঞ্চল্য দেখা যায়। ইন্‌ভিটেশন, টিকিট আর পাশ নিয়ে চলে কোল্ড ওয়ার সবার অলক্ষ্যে। উৎসবের ক'দিন আগে থেকেই দিল্লীর সব নামকরা হোটেল ভর্তি হয়ে যায় ফিল্ম-স্টার এক্সোডাসের জন্য। আই অ্যাণ্ড বি মিনিস্ট্রির কিছু অপাংক্তেয় হরিজন কর্মচারী রাতারাতি গলাবন্ধ কোট পরে 'সাম-বডি' বনে যান। কিছু কিছু মিনিস্টার, এম-পি ও অফিসার থেকে শুরু করে হোটেলগুলোর ক্লাশ ফোর কর্মচারীদের পর্যন্ত চোখেমুখে কেমন যেন রোমান্টিক ভাব ফুটে ওঠে। সারা বিজ্ঞান ভবনের আবহাওয়াটাই উদাস হয়ে যায়। সব মিলিয়ে মন্দ লাগে না। কিছু নামকরা লোককে ছেলেমি করতে দেখে আনন্দ পাওয়া যায় প্রচুর। ফিল্ম-ফ্যানের ভিড়ের মধ্যে ইচ্ছা করে অনিচ্ছার ভাব দেখিয়ে ঢুকে পড়েন বড়কর্তার বৌ-ঝির দল।

মজা এখানেই শেষ নয়। এই কদিন সারা দিল্লীতে ফিল্ম-ছাড়া অন্য কোন আলোচনা অচল। আই এ্যাণ্ড বি মিনিস্ট্রির যেসব হতভাগ্যের দল বিজ্ঞানভবনের গেটকিপারী করে, তাদের মুখেও শুনতে পাবেন জীবন জলীল কারুর গ্রামের মেয়ে, মীনাকুমারী কারো বা প্রতিবেশিনী। বাংলা ফিল্মের অ্যাওয়ার্ড পাওয়াটা প্রায় পাকাপাকি হয়ে গেছে। তাই এই কদিনের জন্য বাংলার বহু নামকরা ফিল্ম-স্টার বা ডাইরেক্টর দিল্লীর বহু বাঙালীর আত্মীয় হয়ে ওঠেন। একটু কান পেতে থাকলে গোল মার্কেটের চায়ের দোকানে শুনতে পাবেন উত্তমকুমার কারো বা "মা-এর সই-এর বকুল-ফুলের ভাইপো-বোনের বোনঝি জামাই" অথবা সুচিত্রা-সুপ্রিয়া কারো বা পিসিমার ননদের কেমন যেন দূর-সম্পর্কের রিলেশন।

এবারে অ্যাওয়ার্ড উৎসবও এই ফরমূলা মত হয়ে গেল। একজন

ডাইরেক্টর আর এক-একজন ফিল্মস্টারের লেজুড় ধরে এসেছিলেন পঁচিশ-তিরিশ জন টেক্‌নিসিয়ান। মধুর করে ভুলেছিলেন এঁরা দিল্লীর আবহাওয়া। ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড বা অনুরূপ উৎসবের সময় কিছু না কিছু নতুন জিনিস চোখে পড়বেই। গতবছর ইন্টারন্যাশন্যাল ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালের সময় অশোককুমারকে নিয়ে এক সেন্ট্রাল মিনিস্টার ও এক আই-সি-এস অফিসারেব হুল্লোড় দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। অশোককুমারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দাদা, কি ব্যাপার! বলেছিলেন, 'বিশ-পঁচিশ বছর আগে একবার আউটডোর সুটিং-এর জন্য গিয়েছিলাম ফ্রন্টিয়ার প্রেভিন্স। উনি তখন ওখানে মিনিস্টার ছিলেন এবং সেই সময় থেকে ওঁর সঙ্গে পরিচয়।' অফিসারটির ছোট ভাই মাস ছয়েক অশোককুমারের সহপাঠী ছিলেন এবং সেজন্য তাঁর আই-সি-এস দাদা অশোককুমারকে নিয়ে একটু মাতব্বরি করেন। এবার দেখলাম মীনাকুমারীকে নিয়ে এক বুড়ো ডেপুটি মিনিস্টারের উৎসাহ। খাতিরের বন্যায় মীনাকুমারীকে হোটেলেই থাকতে দেননি, অতিথি করে রেখেছিলেন আপন গৃহে। শুধু তাই নয়, অভিনেত্রীর সম্মানে আয়োজিত হয়েছিল এক বিরাট ভোজসভা।

বলা বাহুল্য ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড বা ফিল্ম-স্টার নিয়ে আমাদের বড়কর্তাদের যে অসীম উৎসাহ দেখা যায়, ন্যাশনাল ডিফেন্স ফাণ্ড কালেকশনের জন্য তার এক আনা উৎসাহও দেখা যায়নি!

প্রতিবারের মত এবারও অ্যাওয়ার্ড দেবার পরের দিনে 'হায়দ্রাবাদ হাউসে' মিনিস্টার এক রিসেপশন দিয়েছিলেন। কিছু মুড়ি-মুড়কি থেকে হোমরা-চোমরার ভিড়ে হায়দ্রাবাদ হাউসের লন ভরে গিয়েছিল। ওয়াহিদা রহমান রিসেপশান অ্যাটেণ্ড না করেই বোম্বে চলে যাবার জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন বহু অতিথি। রিসেপশন আরম্ভ হবার বেশ কিছু পরে এলেন মীনাকুমারী। তাঁর হোস্ট ডেপুটি মিনিস্টারের সে কি উৎসাহ! আশেপাশের বহুজনকে সরিয়ে দিয়ে বেশ কষ্ট করেই মীনাকুমারীর পাশে দাঁড়িয়ে বারবার ফটো

তুললেন ডেপুটি মিনিস্টারমহোদয়। ঘুরে-ফিরে পরিচয় করিয়ে দিলেন বহুজনের সঙ্গে।

— ইনি মিঃ 'এক্স', আই-সি-এস।

সগর্বে একটু রোমান্টিকভাবে আই-সি-এস বললেন, 'মনে পড়ে বোধহয় সেই বছর তিন আগে পরিচয় হয়েছিল আমাদের। সেই — সেই হে ’

—'সবি মনে করতে পারছি না। এত লোকের সঙ্গে পরিচয় হয় যে মনে রাখাই দুষ্কর।' মীনাকুমারী বললেন।

একটু ঘুরে যেতেই দেখি জবীন জলীলকে ঘিরে রয়েছেন কজন।

—'ইউ নো মিস জলীল, ইনি আমার স্ত্রী। ফিরোজপুর থেকে তিনশ' মাইল এসেছেন শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য।' এক বড়কর্তা এই বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর স্ত্রীকে।

— নমস্তে! আইয়ে না কভি বোম্বে।

— হ্যাঁ জরুর।

সত্যমেব জয়তের সেবকদের কি নিদারুণ উৎসাহ। ফিল্ম-স্টার দেখবার জন্য তিনশ' মাইল দূর থেকে এনেছেন স্ত্রীকে। সাবাস অফিসার সাবাস্!

একদল বাঙালীও এসেছিলেন দিল্লীতে এই উপলক্ষে। কালী-বাড়ীর গাঁদা ফুলের মালা ছাড়া এঁদের ভাগ্যে আর বিশেষ কিছু জোটেনি। একুশে এপ্রিল বোম্বে-মাদ্রাজের সবাই গিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি সন্দর্শনে, যাননি শুধু আমাদের বাঙালী স্টারের দল। কালীবাড়ীর রিসেপশন আর শতখানেক অটোগ্রাফ দেবার পর দিল্লীতে আর কি সম্মান পাবার আছে বলুন! তবে জেনে রাখুন, বোম্বে-মাদ্রাজের ডজন-ডজন ডাইরেক্টর ও স্টারের সঙ্গে দিল্লীর বহু কর্তার পার্সোনাল রিলেশান থাকলেও, বাংলার সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর কেউ দিল্লীর খাসমহলে পরিচিত নন।

তেইশ

প্রতিদিনের ইতিহাস আর অসংখ্য মানুষের মিছিল দেখে চলেছি। বিচিত্র ঘটনা, বিচিত্রতর মানুষ দেখি এই মিছিলে। কখনও অতীত, কখনও ভবিষ্যতের ছবি দেখি সাংবাদিক-জীবনের চলমান প্রদর্শনীতে। কিন্তু এমনভাবে অতীত বাংলায় স্বর্ণযুগের এক অধ্যায়ে ডুব দিতে হবে, একথা কোনদিন ভাবিনি।

······মহারাজ লক্ষ্মণ সেন। বাঙালীর ইতিহাসের এক অধ্যায়ে তাঁর কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে চিরকালের জন্য। দ্বাদশ শতাব্দীর সেই স্মরণীয় দিনগুলিতে আজকের নবদ্বীপ সেদিনের নদীয়ায় রাজত্ব করতেন লক্ষ্মণ সেন। লক্ষ্মণ সেন নিজে বাঙালী ছিলেন না; বাংলা দেশে এসেছিলেন কর্ণাটক থেকে। কিন্তু হৃদয়বত্তার জোরে বাংলার মাটিকে লক্ষ্মণ সেন স্বর্গ জ্ঞান করতেন। তাইতো রাজস্ব আদয়ের চাইতে বাঙালীর সমাজ-জীবনে বিপ্লব আনতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন এই রাজর্ষি লক্ষণ সেন। বাংলার হৃদয়-ঐশ্বর্যভরা মানুষকে তিনি পরমাত্মীয় জ্ঞানে কোলে তুলে নিয়ে দিয়েছিলেন নতুন সামাজিক মর্যাদা। কূপমণ্ডুক বাংলার ব্রাহ্মণ-সমাজ এই মহাপুরুষের মহাবিপ্লবকে ছুত-মার্গে পরিণত করে পরে বাঙালীর সমাজ-জীবনের পবিত্রধারাকে কলুষিত করলেও, লক্ষ্মণ সেনের অক্ষয় কীর্তি আজও সর্বজনস্বীকৃত।·· ··ঝড়ের বেগে ইতিহাসের মোড় ঘুরল। এলো ত্রয়োদশ শতাব্দী। সন-তারিখ ঠিক মনে নেই; তবে বারোশ' দুই কি তিন হবে।·········বাংলার দ্বারে হাতিয়ার নিয়ে আঘাত পড়ল পররাজ্যলোভীর। লক্ষণ সেন ছুটে গেলেন জ্যোতিষীর কাছে। সারা দিবারাত্রির গণনার পর জানা গেল, বাংলার হিন্দু-রাজত্বের দিন আজ শেষ হতে চলেছে, মুসলমান আধিপত্যের যুগ সমাগত। কালবিলম্ব করলেন না লক্ষ্মণ সেন। মাত্র ক'জন আত্মীয়-বন্ধু নিয়ে নৌকায় চড়ে পাড়ি দিলেন পূবের দিকে। এক ফোঁটা রক্তপাত হলো না; মাত্র সতেরো জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বাংলার

গদী দখল করলেন বখ্‌তিয়ার খিলজী। বিধাতাপুরুষের রসিকতার এমন কোন চরম কাহিনী আর কোন দেশের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা জানি না। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন রসিকতার কাহিনী বার বার বহুবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

শোনা যায় লক্ষ্মণ সেন নদীয়া ত্যাগ করে নদীপথে হাজির হন ঢাকা-বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনীর সন্নিকটবর্তী রাম-পাল গ্রামে। এর পরের কাহিনী ডক্টর রমেশ মজুমদার কি ডক্টর নীহার রায় জানলেও সাধারণ বাঙালীর জানা নেই। শুনেছি অনেকে বিশ্বাস করেন, রাম-পালেই লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যু হয়। ঐতিহাসিকরা লক্ষ্মণ সেনের দুই পুত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের উল্লেখ করেছেন। পরে নেপালে আবিষ্কৃত এক সংস্কৃত পুঁথি থেকে লক্ষ্মণ সেনের তৃতীয় পুত্র মধু সেনের খোঁজ পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে ইতিহাসের পাতায় লক্ষ্মণ সেনের কাহিনী এখানেই শেষ।

···অন্ধকার রাত্রি ; তারপর মুষলধারে বৃষ্টি। হেড্‌লাইট জ্বালিয়ে, ওয়াইপার চালিয়েও সামনে কিছু নজরে আসে না। ঢুকে পড়লাম ডেপুটি মিনিস্টার মনমোহনদার বাড়ী। এক কাপ দুধ আর গোটা কতক সন্দেশ খেয়ে আড্ডা দিতে দিতে হদিশ পেলাম যুবরাজ ললিত সেনের।

সেন্ট্রাল হলের আড্ডাখানায় ললিত সেনকে দেখেছি ; কিন্তু পরিচয় ছিল না। টেলিফোন করে পরের দিন সকালেই হাজির হলাম ওয়েস্টার্ণ কোর্টে যুবরাজের সুয়ীটে।

যুবরাজ ললিত সেনের আজকের পরিচয় পার্লামেন্টের মেম্বর বলে। আর এক ধাপ পিছিয়ে গেলে এঁর পরিচয় অধুনালুপ্ত দেশীয় রাজ্য সুকেতের অধিপতিরূপে। এর বেশী বোধকরি অনেকেই জানেন না। অথচ সুকেত রাজবংশ মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের বংশধর বলে দাবী করেন। ওয়েস্টার্ণ কোর্টের বারান্দায় বসে চায়ের পেয়ালা তুলতে গিয়ে নামিয়ে রাখলাম, স্ন্যাকস্‌ ছুঁলাম না। হাঁ করে চেয়ে রইলাম যুবরাজের দিকে। সুকেত রাজবংশের ইতিহাসের কাহিনী

শোনাচ্ছিলেন যুবরাজ ললিত সেন।...লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা নাকি গঙ্গা নদী ধরে উত্তর ভারতের দিকে এগুতে থাকেন। এঁদের এই যাত্রাপথের কাহিনীর পরিচয় আজও বিদ্যমান"।' কুলুর কাছাকাছি আজও এক 'নির্মাণ্ড' তাম্রফলক দেখা যায়। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর পরিচালিত বাংলা ভাষায় এই তাম্রফলকে সেনবংশের এই দীর্ঘ পরিক্রমার কাহিনী লেখা আছে। পাঞ্জাব হিলস-এর পদপ্রান্তেও এমন তাম্রফলক দেখা যায়। সিমলার কাছে সুকেত রাজ্যের রাজধানী। সুরেন্দ্রনগরের রাজপ্রসাদে আজও বহুপ্রাচীন তালপাতার পুঁথি পাওয়া যাবে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলাতেই এই পুঁথিগুলি লেখা। যুবরাজ ললিত সেনের আলমারীতে বাংলা খোদাই বহু ঢাল-তলোয়ার ও নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র আজও মজুত। যুবরাজের হেপাজতে বহু প্রাচীন 'সীল' রয়েছে। লক্ষ্মণ সেন বা তাঁর সন্তানবা এই 'সীল' দিয়ে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করতেন বলে সুকেত রাজবংশেব বিশ্বাস।

যুবরাজ আরো বলছিলেন। বলছিলেন এঁদের গৃহদেবতা হচ্ছেন দশভূজা জগন্মাতা মহিষাসুরমর্দিনী, মাতুর্গা। লক্ষ্মণ সেনের বংশধরদেব সহগামী গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের বংশধররাই আজও নিত্যসেবা করে চলেছেন এই জগন্মাতা চিন্ময়ী দেবী মহিষাসুরমর্দিনীর।

ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে ডক্টর হাচিন সেন ও রেভারেণ্ড ফোগল অপরিচিত নন। এঁদের দুজনেই নাকি দীর্ঘ গবেষণার পর লিখেছেন, সুকেত রাজবংশ বাংলা থেকে পাঞ্জাব 'হিলস'-এ এসেছিলেন এবং এই-বংশের সঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের বংশের যোগাযোগ থাকার সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে করার বহু প্রমাণ আছে। সুকেতরাজ্যের বা পাঞ্জাবের প্রাচীনতম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটারেও এই ঐতিহাসিক ধারার উল্লেখ আছে।

নবদ্বীপের ওপারে জলঙ্গীর ধারে শুকনো বল্লালদীঘি দেখেই বহুদিন পূর্বে বিস্মিত হয়ে অতীত বাংলার মুখোমুখী দাঁড়িয়েছিলাম, তা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। বহুদিন পরে ওয়েস্টার্ণ কোর্টে যুবরাজ

ললিত সেনের কাছে এসে ফিরে পেলাম অতীত স্মৃতি। মন পাড়ি দিল সেই সুদূর অতীত দিনের কাহিনীতে। পেষ্ট্রি-কেক-স্যাণ্ডউইচ-কাজুর প্লেট ভর্তিই পড়ে রইল। চায়ের পেয়ালা ছুঁতেও ভুলে গেলাম।

যুবরাজ বলছিলেন, জানেন ভাই, আমাদের পরিবারের 'মটো' হচ্ছে 'ব্রেক বাট নট বেণ্ড'। শুনেছি লক্ষ্মণ সেনেরও এই 'মটো' ছিল। বাংলায় লেখা আছে এই 'মটো' আমাদের বাড়ীতে।······ একটু উদাস হলেন যুবরাজ। আবার বলেন, বাবার মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এই 'মটো' লেখা পবিত্র আধারটি নিজের হাতে রাখতেন।·· একটু সামলে নিলেন যুবরাজ। আমাদের বাড়ী গেলে দেখতে পাবেন মধ্যযুগীয় বাংলার শিল্পকলার অসংখ্য স্বাক্ষর।

যুবরাজ নিজে ইতিহাসের ছাত্র। আগ্রহের আতিশয্যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপককে দিয়ে নিজেকে টেস্ট করিয়েছেন। পরীক্ষায় জানা গেছে ললিত সেন অস্ট্রোল-নরডিক গ্রুপেরই মানুষ।····· ইতিহাস বলে লক্ষ্মণ সেনের বংশও এই গ্রুপেরই মানুষ।

ইতিহাসের ছাত্র আমি নই। ললিত সেনের বংশপরিচয় নিয়ে গবেষণা করা আমার বিদ্যার বাইরে। বাংলাদেশে গুণীব্যক্তির অভাব নেই। তাই বলি, নিজেদের ইতিহাসের জন্য বিদেশ ঐতিহাসিকদের মুখাপেক্ষী আর না হয়ে বোধকরি সুকেতরাজবংশের ইতিহাস উদ্ধারের দায়িত্ব আমাদের নেবার দিন সমাগত।

চব্বিশ

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন, সৃষ্টিকর্তা বিধাতাপুরুষ বাংলাদেশের মেয়ে গড়তে পুরো সময় দেননি। তাদের আধা-আধি মানুষ গড়েছেন, অন্তর-বাইরের মিল করেননি, মিল হয়নি ব্যথায়-বুদ্ধিতে শক্তিতে আর ইচ্ছায়।

লেক টেরেস-ল্যান্সডাউনের ফ্যাসানেবল মেয়েই হোক আর

বরানগর-বসিরহাট-বালী গ্রামের আধা মডার্ন অথবা বাঁকুড়া বীরভূমের গ্রাম্যবালাই হোন, মোটামুটিভাবে বিধাতাপুরুষের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগের ছাপ এঁরা সবাই বহন করেন।

কিন্তু এই বাঙালী ঘরের মেয়েদের মধ্যেও জ্যোতিষ্কের মত এমন হু'চারজন দুর্লভ চরিত্রের নারীর সন্ধাম পাওয়া যায়, যাঁরা বিধাতা-পুরুষের সব কার্পণ্যের উর্ধ্বে নিজেদের বৈশিষ্টের পতাকা উড়িয়েছেন। এঁরা প্রণম্য। রাঙ্গাকাকিমাও তাই নমস্য।

······অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে আর বেরুলাম না; ঘরে বসে ক্লিমেণ্ট্ এটলীর 'অ্যাজ ইট হ্যাপেনস্' এর পাতা উল্টাচ্ছিলাম। অকস্মাৎ বহুদিন পব ডাক্তার এসে হাজির। বছর চাবেক আগে এক সন্ধ্যায় ডাক্তার এসে জানিয়েছিল, সে দিল্লীর চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছে; আর জানিয়েছিল, সাউথে বেটার অফার পেয়েছে। এরপব একবার ভিক্টোবিয়া টার্মিনাসে মিনিট দশেকের জন্যে দেখা হওয়া ছাড়া ডাক্তারের আব কোনে হদিশ পাইনি। তাই বর্ষার দিনের নিঃসঙ্গতার মধ্যে ডাক্তারকে পেয়ে আটখানা হয়ে পড়লাম। ডাক্তার কিন্তু দিল্লীতে এলে মুখের হাসিকে যমুনাব্রীজের ওপরে রেখে আসে। বলে, দিল্লীতে এলেই কেবল রাঙ্গাকাকিমার কথা মনে পড়ে, ভুলতে পারি না হাসপাতালের সেই দিনটার কাহিনী।

রাঙ্গাকাকিমার কথা আমারও মনে পড়ে। মনে পড়ে পাহাড়-গঞ্জের সেই পড়োঝোড়ো দোতলা বাড়ীর দোতলায় রাঙ্গাকাকিমাব আস্তানা, মনে হয় তাঁর দীর্ঘ সাধনার পবিত্র কাহিনী।···আর মনে পড়ে শেষের দিনের কথা' সেদিন যমুনার পাড়ে সদ্যজাত শিশু-সন্তানসহ রাঙ্গাকাকিমার মরদেহ অগ্নিশিখায় পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছিল।···

বয়স পনর কি ষোল হবে, রাঙ্গাকাকিমা বিধবা হলেন। জগতের ভালমন্দ বোঝবারও বয়সও তখন হয়নি তাঁর। নিতান্তই মধ্যবিত্ত ঘরের বাল্যবিধবা, তাই কোনমনে খানতুই থান কাপড় আর একবেলা দু'মুঠো আলোচালের প্রত্যাশায় বড়জা'র হাত ধরে ভাসুরের সংসারে

ঠাঁই হল এই বাল্যবিধবার। চোখের জল ফেলার পর্যন্ত অবকাশ হয়নি এই দুঃখিনীর। নতুন সংসারে পা দিতে না দিতেই এঁটো বাসন আর ভাসুরের শিশুপুত্রের কাঁথা-কাপড় নিয়ে পুকুর ঘাট যাওয়া শুরু হয়েছিল রাঙ্গাকাকিমার। মাস ছয়েক ঘুরতে না ঘুরতেই মলিনা ঝিকে বিদায় দিলেন গৃহকর্ত্রী। রাঙ্গাকাকিমার পার্ট-টাইম চাকরী এবার ফুল-টাইম হলো, টেম্পোরারী থেকে পার্মানেণ্টও হলেন। সঙ্গে সঙ্গে অ্যালাউন্সও বাড়ল। এর আগে থাকা-খাওয়া-পরা ছাড়াও বড়জার হাতে দু' একটা চড়-থাপ্পড় পেতেন; এবার ফুল-টাইম হবার পর বেশী ভুলত্রুটি ধরবার সুযোগ ও সেই সঙ্গে বড়জার কাছ থেকে আনুপাতিক বেশী অ্যালাউয়্যান্স পাবারও অধিকারিণী হলেন রাঙ্গাকাকিমা।

তবু দিন কাটছিল, মাস ঘুরে বছর পার হলো। হাব-ভাব ও টুকিটাকি কথাবার্তায় ভাসুর মাঝে মাঝে বিধবা ভ্রাতৃবধূর প্রতি সমবেদনা জানাতে গিয়ে নিজের স্ত্রীর কাছে গঞ্জনাভোগ করতেন, এসব রাঙ্গাকাকিমা খেয়াল করতেন। তবুও সময়-সুযোগ ও সর্বোপরি স্ত্রীর চোখের আড়ালে ভাসুরঠাকুর বৌমাকে সান্ত্বনা জানাতে কার্পণ্য করতেন না। এমনি করে আরো ক'বছর কাটল। গৃহকর্ত্রী এখন পানের বাটা সামনে নিয়ে পাড়াপড়শীর সঙ্গে গল্পগুজব আর বাক্স পেটরা টাকা পয়সা সামলাতেই হাঁপিয়ে ওঠেন। রাঙ্গাকাকিমাকে সংসারের আর সবকিছু সামলাতে হয়।

অকস্মাৎ একদিন পিত্রালয় থেকে এক দুঃসংবাদ পেয়ে গৃহকর্ত্রী দ্বাদশ বৎসরের জ্যেষ্ঠপুত্রকে নিয়ে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে চেপে পড়লেন। এত দুঃখের মধ্যেও যাবার সময় স্বামীকে উপদেশ দিতে ভোলেননি। 'বলি একটু খেয়াল রেখো; চাবির বাণ্ডিল যেন আর কাছারিতেই ফেলে এসো না। আর রাঙ্গাকাকিমার থুতনি নেড়ে বলে গেলেন, এদের দু'বেলা দু'মুঠো পিণ্ডি দিতে ভুলো না রাজরাণী।

ছেলে-মেয়েরা স্কুলে; ছোট দু'জন ঘুমিয়ে। রোদ্দুরের মধ্যে ছাতি মাথায় দিয়ে হঠাৎ ভাসুরঠাকুরকে বাড়ী ফিরতে দেখে

রাঙ্গাকাকিমা একটু অবাক হলেন। উঠানে পা দিতে না দিতেই ভাসুরঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, বৌমা, তোমার রান্নাঘরের কাজ শেষ হয়নি? মাথা নেড়ে রাঙ্গাকাকিমা উত্তর দিলেন, হয়েছে। ভাসুরঠাকুর ঘরে ঢুকে জামা খুলে তালপাতার পাখা হাতে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। কয়েক মিনিট বাদেই কোণার ঘরে বসে রাঙ্গাকাকিমা শুনতে পেলেন, বৌমা, একটু শুনে যাও।

জবাব না দিয়ে ধীরপদক্ষেপে ভাসুরঠাকুরের ঘরের দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

'শোন বৌমা, তোমাকে কটি কথা বলব।'

বৌমা দু'পা এগিয়ে গেলেন।

'দূরে কেন? কাছে এস, বসো।'

মাথার ঘোমটা আরো একটু টেনে আরো একটু এগুলেন রাঙ্গাকাকিমা। কিন্তু ভাসুরঠাকুরের পাশে বসলেন না। ভাসুরের এই ব্যবহারে চমকে গেলেন রাঙ্গাকাকিমা। ভাসুরঠাকুরকে ছুঁতে নেই, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে নেই; কিন্তু এ কি? আবার মনে মনেই প্রশ্নের জবাব পান রাঙ্গাকাকিমা। হাজার হলেও ভাসুরঠাকুরের বয়স হয়েছে, তিনি যদি স্নেহের দাবীতে বা সমবেদনা জানাতে কাছেই ডাকেন, তাতে অন্যায় কি?

ভাসুরঠাকুরে প্রথমে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, দুঃখ করো না বৌমা, তোমার দিদির বড় মেজাজ। আরো দু'চারটি সান্ত্বনার কথা।

তারপরের কথা আর বিশদ করে রাঙ্গাকাকিমা বলেননি। শুধু বলেছিলেন ভাসুরঠাকুর সেদিন যেভাবে আমাকে অকাতরে স্নেহবর্ষণ করেছিলেন, তাতে বুঝেছিলাম আমার বিপদ আসন্ন। আর বুঝেছিলাম ভাসুরঠাকুর কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছেন।

বাল্যবিধবার আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা ভাসুরঠাকুর স্ত্রীর অবর্তমানে অনেকদূর এগিয়েছিলেন। কিন্তু রাঙ্গাকাকিমার দুর্জ্জয় মনোবলের জন্য ভাসুরের চরম ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। গৃহকর্ত্রী ফিরলেন। ভাসুরঠাকুরের নেশা তখনও কাটেনি; তাই একদিন স্ত্রীর চোখে ধুলো

দিয়ে রাঙ্গাকাকিমার সঙ্গে গোপনে সমবেদনা বা সান্ত্বনা জানাবার সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে ধরা পড়ে যান। ব্যাস! দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

'সর্বনাশী' 'পোড়ারমুখী' 'দুশ্চরিত্রা' রাঙ্গাকাকিমা নীরবে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করলেন সর্বসমক্ষে।

সাধারণ মেয়ের মত চোখের জল ফেলে দিদির পা জড়িয়ে ধরেননি রাঙ্গাকাকিমা। হঠাৎ মাথায় কে যেন বুদ্ধি দিলে, বলল, অন্যায় যখন করিনি, তখন এমন নীচতা সহ্য করবে কেন! রাঙ্গা-কাকিমার মাথায় আরো বুদ্ধি এলো। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। নিজের সাধনায় সমস্ত কুয়াশার ঊর্ধ্বে সূর্যমাখা নতুনদিনের স্বপ্ন ভেসে উঠল ঐ অনাথিনী বাল্যবিধবার চোখে।

কালবিলম্ব না করে মাত্র চারগাছা ব্রোঞ্জের চুড়ি সম্বল করে সন্ধ্যার অন্ধকারে রাঙ্গাকাকিমা নীরবে নিভৃতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমে হাওড়া, তারপর বেনারস। হরসুন্দরী ধর্মশালায় রাঙ্গাকাকিমার জীবনকাহিনীতে চোখের জল ফেললেন অনাথবাবু ও তাঁর স্ত্রী। চৌকস ব্যবসাদার হলেও অনাথবাবু অত্যন্ত ধার্মিক ও অমায়িক ছিলেন। এদের তীর্থযাত্রার সঙ্গিনী হয়ে রাঙ্গা-কাকিমা এলেন হরিদ্বারে। ফেরার সময় অনেক অনুরোধ-উপরোধ করেও এঁরা তাঁকে কলকাতা নিয়ে যেতে পারলেন না। তবে যাবার সময় রাঙ্গাকাকিমার হাত ধরে বৃদ্ধ অনাথবাবু বলেছিলেন, ভয় পাবার কিছু নেই মা; তোমার এই এই বুড়ো সন্তান যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তোমার কোন চিন্তা নেই।

অনাথবাবুর অর্থানুকুল্যে রাঙ্গাকাকিমা পড়াশুনা শুরু করলেন। পাঁচ বছরের সাধনায় ম্যাট্রিক পাশ করলেন। অনাথবাবুর কাছে চিঠি গেল সব খবর জানিয়ে; শেষে লিখে দিলেন আর কেন? মা হয়ে বুড়ো সন্তানকে ত অনেক কষ্ট দিলাম, এবার আমাকে নিজের চেষ্টায় জীবনে দাঁড়াতে দিন।

এদিকে অঙ্গে অঙ্গে পাক খেয়ে কালবৈশাখীর মত দুরন্ত যৌবন

রাঙ্গাকাকিমার জীবনে এলেও, সেদিক ভ্রূক্ষেপ করেননি। পাহাড়-গঞ্জের এক অন্ধকার গলির দোতলা বাড়ীর উপরতলার একখানি ঘরে রাঙ্গাকাকিমা আবার তাঁর সাধনা শুরু করলেন।

বই-পত্তর জোগাড় করে প্রাইভেটে ইণ্টারমিডিয়েট দেবার জন্য তৈরী হতে লাগলেন। ইতিমধ্যে কি করে যেন নীচের তলার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে রাঙ্গাকাকিমার আলাপ হয়। তারপর? তারপর দশেরার দিন প্রতিবেশীদের অনুপস্থিতির সুযোগে ইনি রাঙ্গাকাকিমার সমস্ত সাধনার সৌধ ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন।

রাঙ্গাকাকিমা অন্তঃস্বত্বা হলেন। সন্তানকে নয়মাস দশদিন গর্ভে ধারণও করেছিলেন। ডাক্তারের হাতে হাসপাতালে রাঙ্গাকাকিমার পুত্রসন্তান প্রথম পৃথিবীর আলো দেখল।

ডাক্তারের কাছে রাঙ্গাকাকিমা তাঁর সমস্ত জীবনকাহিনী শুনিয়েছিলেন। তাই শ্রদ্ধায়-আনন্দে ডাক্তার সেবা করেছিল।

এদিকে অনাথবাবুর দোকান থেকে রাঙ্গাকাকিমার পড়াশুনা ও দিল্লীবাসের সব খবর শুনেছিলেন তাঁর শ্বশুববাড়ীব দেশের এক খদ্দের। সেই খবরের সূত্র ধবে ভাসুরঠাকুর ও তদীয় পত্নী মথুবা বৃন্দাবন-হরিদ্বার-হৃষিকেশ ঘুরে দিল্লী হাজির হলেন। টাঙ্গাওয়ালাকে দশ টাকা জলাঞ্জলি দিয়ে সবশেষে হাজির হলেন হাসপাতালে।

দাই এসে খবর দিলো, বহুজী, আপকো মিলনে কে লিয়ে এক বুড়াবাবু আর এক বুড়ীয়া মাই আয়া হ্যায়!

'জিজ্ঞাসা কর, কোথা থেকে এসেছেন?'

দাই ঘুরে আসতেই বাঙ্গাকাকিমা বললেন, বেড-প্যান লাগাও।

বেড-প্যান এলো; পর্দা দিয়ে রাঙ্গাকাকিমার বেড ঘিরে দেওয়া হলো।

দীর্ঘসময় প্রতীক্ষার পর ভাসুরঠাকুরের তাগিদে দাই বেডপান নিতে এসে এক চীৎকার করে ঘর থেকে ছুটে পালাল। ডাক্তার ছুটে গিয়েছিল; মৃত সন্তানকে বুকে নিয়ে রাঙ্গাকাকিমাকে চির-নিদ্রায় মগ্ন থাকতে দেখে চোখের জল সামলাতে পারেনি। পাশ থেকে সেই

শিশিটা কুড়িয়ে এনে ভাসুরঠাকুরকে ডাক্তার গিয়ে বলেছিল, এই শিশিটা নিয়ে বাড়ী যান; আর রাঙ্গাকাকিমার পবিত্র দেহকে আপনাদের হাতে ছোঁবার দরকার নেই। শেষ কাজটা করতে বোধহয় আপনার সাহায্য না হলেও চলবে।

রাঙ্গাকাকিমা বিদায় নিলেন। আমরা যমুনার জল মাটির কলসীতে ভরে এনে এই বাল্যবিধবার শেষচিহ্ন পর্যন্ত ধুয়েমুছে দিলাম।

হাসপাতালে কত মানুষ জন্মায়, কত মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে জীবন ফিরে পায়; আবার কতজন মৃত্যুর হাত ধরে জীবনের এক সিংহদ্বার পার হয়ে নতুন জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে চলে যায়। ডাক্তার-নার্সের দল জীবন-নাট্যের এই অভিনয় দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু ব্যতিক্রম হয় বৈকি।

রেন-কোট খুলে ডাক্তারকে সোফায় বসালাম; একটু হাসল, আবার কোথায় যেন তলিয়ে গেল ডাক্তার।

পঁচিশ

লণ্ডনপ্রবাসী এক বন্ধুগৃহে খিচুড়ি খেয়ে আণ্ডার-গ্রাউণ্ডের সেণ্ট্রাল লাইনে চড়ে ফিরছিলাম। হোয়াইট সিটি স্টেশন থেকে ট্রেনটা ছাড়ার পর কম্পার্টমেণ্টের চারপাশ চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়ে একটু দূরে এক প্রলম্বিত শাড়ীর আঁচলের উর্ধ্বে এক সুদর্শনা ভারতীয় নারীর মুখ নজরে পড়ল। লণ্ডনে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে বা বাসের মধ্যে দু, একজন ভারতীয় দেখতে পাওয়াটা নিতান্তই স্বাভাবিক। তাই নজর ফিরিয়ে নিলাম। হল্যাণ্ড পার্ক, নটিং হিল গেট, কুইনসওয়ে, ল্যাংকাস্টার গেট, মার্বেল আর্চ, বণ্ড স্ট্রীট স্টেশন পার হতেই উঠে দাঁড়ালাম। অক্সফোর্ড সার্কাসে নেমে পড়লাম। বেকারলু লাইনের গাড়ী ধরে পিকাডেলী সার্কাস যাবার জন্য অন্য প্লাটফর্মের দিকে এগিয়ে যাবার সময় কম্পার্টমেণ্টে-সঙ্গিনীকে আবার নজরে পড়ল। হঠাৎ যেন মনে হল, কোথায় যেন দেখেছি। শীতের সন্ধ্যায় প্রাণপণে মাথায় ধোঁয়া

দিয়ে ব্রেনকে সাফ করে নিলাম ; কিন্তু তবু মনে পড়ল না কোথায় দেখেছি। অথচ 'দেখেছি' 'দেখেছি' ভাব মনের মধ্যে থেকেই গেল। কাজের মধ্যে কদিন কেটে গেল। তারপর এক ভারতীয় কূটনৈতিক বন্ধুর আমন্ত্রণে ইণ্ডিয়া হাউসের উপরতলার রেস্টুরেন্টে কাঁটা-চামচ দিয়ে ডাঁটাচচ্চড়ি খেতে গিয়ে ঠিক পাশের টেবিলে সেই 'তন্বীশ্যামা-অধরাবসনা'কে এক যুবকের সঙ্গে মশগুল হয়ে গল্প করতে দেখলাম। ঐ সিচুয়েশনে আমার মত বয়সের মানুষের পক্ষে ভদ্রমহিলাকে বিব্রত করা সমীচিন বোধ করলাম না। মনের প্রশ্ন মনেই র'য়ে গেল।

কদিন ঘুরে-ফিরে দিল্লী চলে এলাম। ভদ্রমহিলার স্মৃতিও মন থেকে মুছে গেল।

দীর্ঘকাল পর এক বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের প্রেস-সেক্রেটারীর দিল্লীত্যাগের প্রাক্কালে তাঁর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলাম গলফ লিঙ্কে। একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। অভ্যাগতের দল আগেই এসে গিয়েছিলেন। আমন্ত্রণকারী ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী সাদরে অভ্যর্থনা করলেন ; পরিচয় করিয়ে দিলেন কয়েকজন অপরিচিতের সঙ্গে। হোয়াইট হর্স, স্কচ, রাম, জিন, শেরী অথবা একটু ব্রাণ্ডির গেলাস নিয়ে সবাই ব্যস্ত। ছোট ছোট দলের আলোচনায় আমিও মিশে গেলাম। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ নিজেকে দেখলাম এক আধা-পরিচিতার পাশে। ধোঁয়া দিয়ে আবার ব্রেনটা সাফ করে নিলাম। মনে পড়ল, একেই তো দেখেছিলাম লণ্ডন আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে আর ইণ্ডিয়া হাউসের রেস্টুরেন্টে।

—এক্সকিউজ মি, আই সাপোজ উই হ্যাভ মেট বিফোর।····· ওয়ার ইউ ইন লণ্ডন লেট লাস্ট ইয়ার ?

জিন-লাইম ওয়াটারের গেলাসটা পাশে রেখে বললেন, সারটেনলি, আই ওয়াজ ভেরী মাচ্ দেয়ার। ইউ ওয়ার অলসো দেয়ার······

হ্যাঁ।

আলাপ হল। ইংরেজি থেকে বাংলায় কথাবার্তা বললাম। দীর্ঘদিন পূর্বে যেকালে কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে মাঝে মাঝে পনের

কি পঁচিশ টাকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চেক পেতাম সেকালে তিনশ' সত্তর দশমিক চার মিটারে মিস সেনের কণ্ঠস্বর নানাকারণে প্রায়ই শোনা যেত। বর্তমানে অন্য কোন কর্মব্যপদেশে দিল্লীতে অবস্থান।

কথাবার্তা বলতে বলতে মিস সেন হঠাৎ আমাকে একটু দৃষ্টিকটুভাবে ধাক্কা দিয়ে পাশ ঘুরে মিঃ বেকারের হাতটা চেপে ধরলেন। চমকে গিয়েছিলেন বেকার সাহেব। সামলে নিয়ে বললেন, ইউ নটি গার্ল। ··+ মিস সেনের রক্তাভ রঙীন গালে একটা টোকা মেরে বললেন, উইদাউট এনি ড্রিংকস? ·কাম অন, হ্যাভ মাইন।

বেকারসাহেবের ডান হাতের উপব নির্লিপ্তভাবে দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে মিস সেন বেকারের হুইস্কীব গ্লাসে চুমুক দিলেন। অসম্বৃত বেশ-বাস নিয়েই মিস সেন পার্টির শেষমুহূর্ত পর্যন্ত বেকারসাহেবের বাহুবন্ধনের উষ্ণ স্পর্শ উপভোগ করলেন। তারপর মধ্য-রাত্রির প্রাক্কালে মিঃ বেকাবের পাশে বসে বিদায় নিলেন মিস সেন।

কলকাতা বেতারকেন্দ্রে যাকে পুরুষ দেখলে দশ হাত দূর দিয়ে শাড়ির আঁচল টেনে টেনে দেহাবরণের আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে সলজ্জ পদসঞ্চারণ করতে দেখতাম, সেদিন রাত্রে সেই মিস সেনকে প্রমত্ত ও-অসম্বৃত অবস্থায় বেকারসাহেবের কাঁধে মাথা রেখে মধ্যরাত্রিতে উধাও হতে দেখে একটু বিস্মিত না হয়ে পারিনি।

দিল্লীর সমাজ-বন্ধনহীন জীবনে মিস সেনের এই বিবর্তনে বিস্মিত হবার কারণ নেই। আমিও তাই বিস্মিত হইনি। এরপর মাঝে মাঝে জনপথের দোকানে, কনট প্লেসের সপিং সেণ্টারে, কখনও কখনও 'শীলা' বা 'রিভোলি' চিত্রগৃহে সলোমন এ্যাণ্ড সেবা বা হিচ্‌ককের কোন না কোন ফিল্ম দেখতে নানা সান্নিধ্যে মিস সেনকে দেখেছি। কদাচিৎ কখনো গেল্ডর্-ওয়েঙ্গারে এসপ্রেসো কফি 'বারে' বা ডাইনিং-রুমে দেখা হলে মিস সেন ব্যাগ থেকে সিগারেট-কেস খুলে সামনে ধরেছেন। 'কাম অন জার্নালিস্ট, হ্যাভ এ সিগারেট।'

নিঃশব্দে মাথা নিচু করে আদেশ শিরোধার্য করে সিগারেট তুলে নিতেই লাইটার জ্বেলে ধরেছেন মিস সেন। মুহূর্তের মধ্যে সিগারেটের ধোঁয়ায় অন্তর্হিত হতেন মিস সেন। কানে শুধু ভেসে আসত, বাই, বাই, সী ইউ লেটার:

বছরখানেক আর হদিশ পাইনি মিস সেনের। খবর নেবার আগ্রহ বা সাহস হয়নি। তাছাড়া খবর করব কোথায়? বহুজনের হৃদয়ে যাঁর স্থান, অসংখ্য মানুষের সাহচর্যে যাঁর বিচরণ, তাঁর খবর করি কোথায়?

কিছুকাল আগে নিত্যকার মতন দৌড়ে দৌড়ে লাফ মেরে পার্লামেণ্টের সিঁড়ি দিয়ে প্রেস গ্যালারি যাবার পথে ভিজিটার্স গ্যালারির লাইনের মধ্যে অকস্মাৎ এক নতুন বেশে মিস সেনকে দেখে চমকে গেলাম। চওড়া কপালের মাঝে বিরাট গোলাপী টিপ, ঘন কালো কার্লিং হেয়ারের মাঝেও টানা সিঁদুর, মাথায় কাপড়, গায়ে-হাতেও যেন কিছু নতুন গহনা দেখলাম। প্রথম ঝলকে বেশ লাগল। ভাবলাম, হয়ত বা অসংখ্য হৃদয়ের হাটের মধ্যে ভালবাসার অভিনয় বিক্রী করে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন মিস সেন; তাই এবার মহাজন ঠিক করে ভবিষ্যতের দেওয়া-নেওয়া কারবার সীমাবদ্ধ রাখতে চান। মনে মনে জিজ্ঞাসা করলাম, সব মেয়েই কি স্ত্রী হতে চায়? হয়ত তাই।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন? নতুন জীবন ভাল লাগছে তো?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, মীট মাই হাসব্যাণ্ড।

তারপর এই কদিন আগে 'ওডিয়নে' 'ভি-আই-পি'র অ্যাডভান্স বুকিং'এর লাইন দিতে গিয়ে শ্রীমতীর দর্শন পেলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, সিঁদুর কই? মাথার ঘোমটা?

—'একা এসেছেন? ভাগ্যবান কোথায়?'

কড়া মেজাজে উত্তর পেলাম, আর ইউ টকিং এ্যাবাউট ছাট ইডিয়ট......প্লিজ ডোণ্ট...

মুনি-ঋষিরা নিশ্চয়ই বহু মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। কারণ তা না হলে 'দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা'-র অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন কি ভাবে ?*

দ্বাবিংশ

'টি হাউস থেকে বেরিয়ে সবে 'লক' খুলে গাড়ীতে উঠতে গেছি, এমন সময় হঠাৎ পিঠে চাপড় খেয়ে পিছন ফিরে দেখি মেজর হাসছে। পাশে দেখি এক সুদর্শনা; বুঝতে দেরী হল না তিনি আমার কুন্তলাদি।

'তারপব, হাউ আর ইউ জার্নালিস্ট ? নিশ্চয়ই খুব সারপ্রাইজড্!'

'তাতো বটেই। ভাবতেই পরি না মেজর লাডাকেব চুশুল, মানার, লে থেকে নেমে দিল্লী আসতে পারে।'

'অনটু পার্লামেন্ট, না বাড়ী ফিরছ ?'

'মেজর, মিলিটারীর-মত জার্নালিস্টরা প্ল্যান করে মুভমেণ্ট করে না, মুভমেণ্ট করেই প্ল্যান করে। সুতরাং কোন প্ল্যান নেই, তবে মুভমেণ্ট চলবে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত…।'

'আরে তোমার সঙ্গে তো আলাপ করিয়েই দিইনি। ইনি হচ্ছেন…… '

মুখেব কথা কেড়ে নিয়ে বললামঃ কুন্তলাদি, কুন্তলা সেন। আদি নিবাস বীরভূমের রামপুবহাট, তবে শতাধিক বছব ধরে তিন পুরুষ লক্ষ্ণৌ' এর বাসিন্দা। ইক্‌নমিক্স ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের ছাত্রীরূপে লক্ষ্ণৌ' এঁর কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত।..

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে কুন্তলাদি বললেন, কি আশ্চর্য! আপনি এত কথা জানলেন কিভাবে ? আপনি কি লক্ষ্ণৌ' এর…

'লক্ষ্ণৌ গেছি বহুবার, কিন্তু বাসিন্দা নই।' মনে মনে বলতে ইচ্ছা করল, মেজরের অদৃষ্ট দেখে মনে হয় বাসিন্দা হলেই ভাল হতো।

---

*নিতান্তই স্বাভাবিকভাবে চরিত্রের নামগুলি কাল্পনিক দেওয়া হয়েছে।

কুন্তলাদিকে আগে থেকেই একটু শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলাম নিজের অন্তরে, তাই সেকথা আর বলতে পারলাম না।

কুন্তলাদি বললেন, তাহলে আপনি কি তান্ত্রিক, না জ্যোতিষী ?

'কোনটাই নয়।'

মেজর যে এতক্ষণ মুখ টিপে টিপে হাসছিল, সেদিকে কুন্তলাদির খেয়ালই হয়নি। মেজর হঠাৎ সিরিয়স হয়ে বলল, এদের ঘাঁটিয়ে লাভ নেই কুন্তলা। জার্নালিস্টরা পারে না বা জানে না, এমন কিছু হতে পারে না। তর্ক করো না, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে।

দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হল। মেজরের হাসি দেখে কুন্তলাদি বুঝলেন সেই সব ফাঁস করে দিয়েছে। ভ্রূ কুঁচকে ইঙ্গিতে মেজরকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন কুন্তলাদি।

আর কোন তর্ক-বিতর্ক না করেই মেজর ও কুন্তলাদি গাড়ীতে উঠলেন। বোম্বের মহাত্মা গান্ধী সুইমিং পুলে যেমন অর্ধ-উলঙ্গ অভিনেত্রীদের সাঁতার কাটার জন্য মহাত্মাজীর নাম কলঙ্কিত হচ্ছে, তেমনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর নাম ডুবাবার আয়োজন হয়েছে রাজধানীর বুদ্ধজয়ন্তী পার্কে। তাই সেদিকে আর গেলাম না, চাণক্যপুরীতে নেমে পড়লাম।

'আপনি তো চকোলেট বার ভালবাসেন। কিনতে পারি কি ?'

এতক্ষণে হাসি দেখলাম কুন্তলাদির মুখে। টানা চোখের হাসিমুখে সম্মতি জানালেন আমার প্রস্তাবে।

আইসক্রীম খেতে খেতে 'শান্তিপথে'র ঘাসে-মোড়া পথ দিয়ে চলেছিলাম তিনজনে পাশাপাশি। অস্তগামী সূর্যের শেষ তির্যক রশ্মি উঁকি দিচ্ছিল চাণক্যপুরীর এম্বাসী বিল্ডিংগুলোর চূড়ায় চূড়ায়। প্রশান্ত পরিবেশে দুটি হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শে মনে মনে একটু যেন উত্তেজনা বোধ করছিলাম। পরের দিন সকালেই মেজর লাডাকের পথে পাঠানকোট রওনা হবে শুনে মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। বিদায়ের পূর্বসন্ধ্যায় ওঁদের দুজনের মাঝে নিজেকে রাখাটা সমীচীন বোধ করলাম না।

'কিছু যদি মনে না করেন, একটা গান শুনতাম; শোনাবেন 'শেষ পারানির কড়ি কণ্ঠে নিলেম।'

এক কথায় রাজী হলেন কুন্তলাদি। শুধু একটু টিপ্পনী কেটে বললেন, ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলে বেশ ত কাজ আদায় করতে পারেন আপনি।

গান গাইলেন চমৎকার। সেদিনের সন্ধ্যায় আমার আর কিছু প্রত্যাশা ছিল না, বিদায় নিলাম পরের দিন স্টেশনে দেখা করার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে।

......স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষের পুণ্য-তীর্থ থেকে জোর করে দূর করে দেওয়া হল অশুচি পর্তুগীজ উপনিবেশিকদের। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মাঝে মাঙ্গোভি নদীর পারে উড়ল তেরাঙ্গা। ইতিহাসের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা বসে আছি কাউন্সিল হলে মিলিটারী গভর্নর মেজর-জেনারেল ক্যাণ্ডেথের প্রেস কনফারেন্সের জন্য। প্রেস কনফারেন্স আরম্ভ হতে তখনও কিছু বিলম্ব আছে দেখে ঘুরে ফিরে আলবুকার্ক, ভাস্কো ডা গামা প্রভৃতির বিবাট বিরাট অয়েল-পেন্টিংগুলো দেখছিলাম। সাড়ে চারশ' বছরের অতীত দিনগুলির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেন একটু আনমনা হয়েই পড়েছিলাম। পিছন থেকে কে যেন আমার কাঁধে হাত রাখলেন; ফিরে দেখি এক মেজর। দৃষ্টি বিনিময় হতে না হতেই মেজর-জেনারেল ক্যাণ্ডেথ কাউন্সিল হলে এসে পৌঁছলেন। তাই তখন আর কথা হয়নি। পরে হোটেল মাঙ্গোভির 'বারে' পেয়েছিলাম মেজরকে। মনে আছে, প্রায় বাসররাত্রি যাপন করেছিলাম দু'জনে; কথায় কথায় কোথা দিয়ে যে রাত কেটে গেল তার টেরও পাইনি।'

সে সব কথা মনে ছিল, কিন্তু অফিসারকে বোধকরি ভুলে গিয়েছিলাম।

অক্টোবরে চীনের আক্রমণের পর প্রথম পর্যায়ে যে সামান্য ক'জন ভারতীয় ও বিদেশী সাংবাদিককে বমডিলা, দারাঙ, জোন ও সেলা পাশ দেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে আমিও ছিলাম।

দিল্লী ফিরতে না ফিরতেই শুনলাম, লাডাকের 'ফ্রন্ট লাইনে'ও সাংবাদিক যেতে দেওয়া হবে। দেশী-বিদেশী সাংবাদিকের দশজনের প্রেস পার্টিতে আমিও স্থান পেলাম।

চুশুল, মাগারহিল প্রভৃতি দেখে ফিরে এসেছি লাডাকের রাজধানী লে'-তে। সন্ধ্যায় অফিসার্স ক্লাবে সোমরস পানের আসরে নরক গুলজার হচ্ছে, এমন সময় স্নো ক্লোদিং পরে ধূলা-বালি মাখা ক'জন অফিসার ঘরে ঢুকতেই ভীষণ হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। লাডাক সীমান্তে শেষ বুলেট পর্যন্ত চীনা সৈন্যদের মুখোমুখি হয়ে যাঁরা অসীম শৌর্যের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, এঁরা তাদেরই জীবিতদের ক'জন। ব্রিগেড হেড্ কোয়ার্টার্সের একজন অফিসার আমাদের সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

অফিসার আমার সঙ্গে খুব জোর একটা হ্যাণ্ডসেক করে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, ইফ মাই মেমারি ইজ কারেক্ট, দেন উই হ্যাভ মেট বিফোর।

—'নেফায় কি? তেজপুরে? বোমডিলায় না সেলা পাশে?

—'নো জার্নালিস্ট নট ইন নেফা বাট আই সাপোজ ইন গোয়া।'

মুহূর্তের মধ্যে দুজনে ফিরে পেলাম অতীত স্মৃতি। দুজনে দুজনকে আলিঙ্গন করলাম। ঘরবাড়ী থেকে বহু দূর ভারতবর্ষের অন্তিম প্রান্ত লাডাকে এসে মেজরকে পেয়ে পরমাত্মীয় লাভের স্বাদ পেলাম। ক্লাব থেকে আমাকে প্রায় 'কিডন্যাপ' করে নিয়ে গেল মেজর।

বাইরে আবছা চাঁদের আলো আর বরফ পড়ছে ধীরে ধীরে। চারিদিকে গিরিরাজ হিমালয়। আশেপাশে চারপাশ নিস্তব্ধ। এমন পরিবেশে আমাকে পেয়ে মেজর কেমন যেন উদাস হয়ে গেল।

.........'আচ্ছা, আমরা যারা লড়াই করছি, তাদের কথা কেউ ভাবে? সারা দেশের মধ্যে এমন কি কেউ আছে, যে আমাদের মৃত্যুর পর এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে···অন্ততঃপক্ষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস।···এই ত কত সহকর্মীকে বিসর্জন দিয়ে এলাম, কিন্তু

একফোঁটা চোখের জল ফেলার অবকাশ পর্যন্ত পাইনি, লড়াই করতে করতে তাঁদের দিকে একবার ফিরে দেখতে পাইনি।'

গেলাসে আরো খানিকটা হুইস্কী ঢালল মেজর, কিন্তু এক চুমুক দিয়েই নামিয়ে রাখল। আবার বলে, বরফে ঢাকা হিমালয়ের কোলে হয়ত আমারও দেহ একদিন অনন্তকালের জন্য লুটিয়ে পড়বে। যদি কোন সহকর্মী অবকাশ বা সুযোগ পায়, হয়ত গলার একটা চাকতি ছিঁড়ে নিয়ে কুন্তলাকে পাঠাবার চেষ্টা করবে·· ···।

কুন্তলার নাম আসতেই মেজর চট করে থেমে গেল। হঠাৎ যেন কোথাও তলিয়ে গেল মেজর।

—'পৃথিবীতে কত কোটি মেয়ে আছে বলতে পারো জার্নালিস্ট?'

—'না।'

—'তবে জেনে রেখো এমন মেয়ে খুব বেশী নেই।'

মেজরের আদিবাস মেবারে। পূর্বপুরুষ রাণা প্রতাপের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিলেন মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে। মেবার পতনের পর মোগল সম্রাটের অনুচররা মেজরের পূর্বপুরুষকে অকথ্য অত্যাচার করতে থাকলে এঁরা চলে আসেন আগ্রা, তারপর লক্ষ্ণৌ। মেজরের জন্ম ঐখানেই এবং সেইখানেই কুন্তলাদির সঙ্গে ওঁর আলাপ, পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। সময়ের ব্যবধানে তা গভীর ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। অফিস পালিয়ে, ছুটি নিয়ে মেজর পড়াত কুন্তলাদিকে। ইকনমিক্সে ব্রিলিয়াণ্ট রেজাল্ট করলে কুন্তলাদির ঠাকুমা বলেই ফেলেছিলেন, এতে আর কুন্তীর বাহাদুরী কি আছে! অর্থ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা ও আভিজাত্য ছিল কুন্তলাদিদের; তাই মেজরের সঙ্গে তাঁর বিয়েতে পরিবারের মত পেলেন না কুন্তলাদি।

লক্ষ্ণৌতে আর টিঁকতে পারল না মেজর; জয়েন করল আর্মিতে। কিছুদিন বাদে কুন্তলাদিও বেরিয়ে পড়েছিলেন। ইকনমিক্সে লেকচারার হয়ে প্রথমে গেলেন বরোদা, তারপর পুণা, সেকেন্দ্রাবাদ, কটক, দিল্লী, মীরাট ও আরো কত জায়গা। বলা বাহুল্য দুজনের কেউই বিয়ে করেননি। কিন্তু 'নেকস্ট টু কিন'

হিসেবে মেজর আর্মিতে নাম দিয়েছেন কুন্তলাদির। কুন্তলাদি মেজরের মন্ত্রপড়া স্ত্রী নয়, কিন্তু সহধর্মিণী নিশ্চয়ই। বছরে একমাস করে দুজনে একত্রিত হন। প্রথম প্রথম বেশ কিছু গুজব চালু হয়েছিল দুজনেরই আত্মীয়মহলে ; সমালোচকের দল পরে বুঝেছিলেন, যে আগুন একজনকে দগ্ধ করে, সেই আগুনে অন্যকে পবিত্র করে।

মেজরের ছুটি পাবার কথা ছিল নভেম্বরে ; কিন্তু চীনা দস্যুদের হামলায় সব প্ল্যান বানচাল হয়ে যায়। ক'মাস পর মাত্র এক সপ্তাহের ছুটি পেয়ে দুজনে মিলেছিলেন দিল্লীতে।

পরের দিন স্টেশনে বিদায় জানালাম মেজরকে। ট্রেন ছাড়ার আগে মেজরকে প্রণাম করলেন প্রফেসর কুন্তলা সেন ; মাথায় হাত দিয়ে মেজর করলেন আশীর্বাদ। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে একটা উল্টোদিকের ট্রেনে চেপে কুন্তলাদিও দিল্লী ত্যাগ করলেন। ট্রেন ছাড়ার আগে নিজের মধ্যে কেমন যেন একটা আর্তনাদের আওয়াজ শুনতে পেলাম ; বোধকরি দু'ফোঁটা চোখের জলও গড়িয়ে পড়েছিল। কুন্তলাদি শুধু বলেছিলেন, দুঃখ করো না ভাই। মেজর বেঁচে থাকলে আমিও বেঁচে থাকব ; আর তোমার সঙ্গেও নিশ্চয়ই দেখা হবে।

মথুরা রোড দিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ী চালিয়ে বাড়ী ফেরার পথে বার বারই মেজরের কথাটা মনে পড়ছিল, জান জার্নালিস্ট, কুন্তলা আমার রাজলক্ষ্মী।

সাতাশ

বছরের সেই দিনটি আবার এসে চলে গেল। এলাহাবাদের জর্জ টাউন, টেগোর টাউন, কটরা, সিভিল লাইনস, লক্ষ্ণৌ'এর কিছু কিছু লোক ছাড়া হয়ত আর কেউ তাঁকে আজ মনে করেন না। এরজন্য আশ্চর্য হবার কি আছে ? যে গান্ধীজী ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি মানুষের জীবনে পরাধীনতার বন্ধনমুক্তি এনেছেন বলে দাবী করা হয়, সেই মহাত্মার বিদেহী আত্মার স্মৃতিতর্পণে আজ জওহর-লালজী না এলে কয়েক ডজন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। যে সর্দার

প্যাটেল পাঁচশ বাহান্নটি দেশীয় রাজ্যকে বৃহত্তর ভারতবর্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ার স্বপ্ন সার্থক করেছিলেন, সেই 'লৌহমানবের' জন্মদিনের সমাবেশে কনষ্টিটিউশন ক্লাবে আজ বক্তা আসেন, কিন্তু শ্রোতা পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জন্ম-দিনে কলকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভায় খবরের কাগজের রিপোর্টার, সভাপতি, প্রধান অতিথিসমেত জন পনের-কুড়ির বেশী হয় বলে আজ পর্যন্ত দেখিনি। ফিরোজ গান্ধীকে ভারতবর্ষের মানুষের এক বৃহত্তর অংশ না চিনলেও দুঃখ নেই; কারণ তাঁর স্বল্পকালীন কীর্তিকাহিনী স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের পাতায় এক অধ্যায় হয়ে রইবে। ইদানিংকালে আমাদের পার্লামেণ্টে ডাঙ্গে, গোপালন, হীরেন মুখার্জি, কৃপালনী, অশোক মেটা, মীনু মাসানী, আচার্য রঙ্গ, ফ্রাঙ্ক এ্যান্থনী, প্রকাশ বীর শাস্ত্রী প্রভৃতির চাইতে যিনি ট্রেজারী বেঞ্চকে বেশী বিপর্যস্ত ও চমকিত করেছেন তিনি ফিরোজ গান্ধী। ফিরোজ সাধারণতঃ খুব বেশী প্রশ্ন বা বক্তৃতা করতেন না; কিন্তু একবার উঠে দাঁড়ালে সমস্ত হাউসের মধ্যে এক বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে যেত।

হাসতে হাসতে মৃদু কশাঘাত করে অপ্রিয় সত্য পরিবেশন করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ফিরোজ গান্ধীর। সেণ্ট্রাল হলের কোণে বসে একদল এম-পি আর মিনিস্টারের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন ফিরোজ। একজন আধা-সোস্যালিস্ট মিনিস্টার এসে পাশে দাঁড়ালেন। 'আইয়ে সাব তসবীর রাখিয়ে' বলে ফিরোজ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। দু'চার মিনিট একথা-সেকথার পর ফিরোজ বল্লেন, আমাদের দেশে তিন রকমের সোস্যালিস্ট আছে। এলাহাবাদের পেয়ারার মত প্রথম শ্রেণীর সোস্যালিস্টদের বাইরে সাদা কিন্তু ভিতর লাল; দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে বিটের মতন—যাদের ভিতরে-বাইরে একেবারে লালে লাল; তৃতীয় ধরনের সোস্যালিস্টরা হচ্ছে বিলেতী মূলার মত —বাইরে লাল কিন্তু ভিতরে ভিতরে ধবধবে সাদা। আশেপাশের এম-পি মিনিস্টারের দলের কেউ কেউ বেশ অস্বস্তি বোধ করছে

আরম্ভ করেছেন ; ফিরোজ বুঝেও বুঝলেন না। বণ্ড'এর উপর রসান চড়িয়ে বললেন, কংগ্রেস বিলেতী মূলার মত সোস্যালিস্ট, দিয়ে ভরে গেছে। পাশের এক আধা-সোস্যালিস্ট এম-পিকে হাত ধরে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তাই নয় কি ?

থিমায়া-অধ্যায়ের পর কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টিতে ঝড় বয়ে গেল কৃষ্ণ মেননের বিরুদ্ধে। সমালোচনার টুকিটাকি জবাব দিলেন নেহরু ; কিন্তু অনেকেই সন্তুষ্ট হলেন না। বহুজনেই মেননের কাছে সরাসরি বহু প্রশ্নের জবাব চাইলেন। মেনন নেহরু দুজনেই সমালোচনার জবাব দিলেন ; তবুও উত্তেজনা কমল না। পিছনের দিকে চুপচাপ বসে বসে খেয়াল করছিলেন ফিরোজ গান্ধী। তারপর নিজেই এগিয়ে এস মাইকেব সামনে দাঁড়ালেন। কোন লুকোচুরি না করে সোজাসুজি বললেন, কৃষ্ণ মেনন যে প্রাইম মিনিস্টারের তোতা পাখী একথা সবাই জানেন। মেনন হাঙ্গেরী বা অন্যান্য বিষয়ে ইউনাইটেড নেশানস'এ যা কিছু বলছেন, তা পবরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়েব অনুমতি নিয়েই তিনি বলেছেন, সুতবাং যাঁদের সাহস আছে তাঁরা যেন সরাসরি প্রাইম মিনিস্টারের সমালোচনা করেন, মেননের নয়। আর বেশী কিছু বললেন না ফিরোজ ; ফিরে এলেন নিজের আসনে। পার্লামেণ্টারী পার্টির উত্তেজনাও থিতিয়ে পড়ল।

পার্লামেণ্টের মেম্বার হবার পর ফিরোজ একটা এম-পিজ, বাংলো নিয়েছিলেন। সকাল বেলা প্রাইম মিনিস্টার, শ্রীমতী গান্ধী ও নিজের ছেলেদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেয়ে চলে আসতেন নিজের বাংলোয়। সেখানে বহুজন আসতেন নানা কাজের জন্য ; অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিকার জানিয়ে অনুরোধ আসত অসংখ্য। সাধ্যমত এদের সাহায্য করতেন ফিরোজ। একদিন সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ একদল গয়লা এসে হাজির। বাবুজী বাঁচাও, বাবুজী বাঁচাও করে এরা ফিরোজের হাত পা জড়িয়ে ধরল। গয়লারা জানাল, নিউ দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কমিটির লোকেরা ওদের গরু-মোষ নিয়ে গেছে ; গরু-মোষ ফেরত না পেলে না খেয়ে মরবে।

মহামুস্কিলে পড়লেন ফিরোজ। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্লেন, দেখ ভাই, মানুষের চিন্তা করেই কুলকিনারা পাই না, তার ওপর আবার ঐসব—।

নাছোড়বান্দা গয়লার দল। 'বাবুজী বাঁচাইয়ে, নেইত না খেয়ে মরব আমরা সবাই।'

নিরুপায় হয়ে ফিরোজ শুনলেন ওদের কাহিনী। নিউদিল্লী মিউনিসিপ্যাল কমিটি ও দিল্লী কর্পোরেশনের দুই এলাকার মধ্যবর্তী এক 'নো-ম্যানস ল্যাণ্ডে' এই গয়লাদের বাস। হঠাৎ কিভাবে তাড়া খেয়ে গোটাকতক গরু-মোষ ছুটে যেতেই নিউদিল্লী মিউনিসিপ্যাল কমিটির লোকেরা গরু-মোষদের আটকে রেখেছে।

এই বিষয়ে খোঁজ কবার জন্য ফিরোজ কমিশনারকে টেলিফোন করলেন। কমিশনার ঠিক কোন বর্ডার এরিয়ায় এই ঘটনা ঘটেছে তা বুঝতে পারলেন না। ফিবোজ তখন বললেন, কমিশনার হয়ে আপনিই যদি আপনার এরিয়ার বর্ডারের খোঁজ না রাখেন, তবে গরু-মোষ সে খবর কি করে রাখবে বলুন তো?

বলা বাহুল্য কমিশনারসাহেব আর বেশীদূর না এগিয়ে গয়লাদের গরু-মোষদের ছেড়ে দিয়েছিলেন।

সামান্য অবস্থা থেকে দীর্ঘ সংগ্রামের পর জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন ফিরোজ। তাই সংগ্রামশীল মানুষের প্রতি তাঁর সমবেদনা আমাকে মুগ্ধ করত। দিল্লী ইউনিভার্সিটির একদল ছাত্র অর্থাভাবে বই কিনতে না পেরে পড়াশুনা বন্ধ করার উপক্রম করলে কোনপ্রকারে সে খবর এসে পৌঁছাল ফিরোজের কানে। এদের টেক্সট বুক কিনে দিলেন ফিরোজ; আর খুলে দিলেন নিজের বিরাট লাইব্রেরীর দরজা। বহুদিন বিকালের দিকে ফিরোজকে এদের নিয়ে বসতে দেখতাম, পড়াতেন ইকনমিক্স, পলিটিক্স।

প্রথম প্রথম দিল্লী এসে পার্লামেণ্টের রিপোর্টে কিছু কিছু ভুল ত্রুটি থাকত আমার। বিকেলের দিকে ওঁর লাইব্রেরীতে বসে বসে আমাকে ইনি নিয়মিত পার্লামেণ্ট রিপোর্ট করার রীতি-নীতি বুঝিয়ে দিতেন।

ফিরোজের মৃত্যুতে আর কিছু না হোক, পার্লামেণ্টের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। চলাপতি রাও ফিরোজকে বলেছেন, 'এ হাফ ফিনিশড্ পোর্ট্রেট।' অর্ধ-সমাপ্ত পোর্ট্রেট হয়েই ফিরোজ মুন্দ্রা, এল-আই-সি, টি-টি কে'কে নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন; না জানি বেঁচে থাকলে আরো কত ইতিহাস সৃষ্টি করতেন।

আঠাশ

ডিফেন্স মিনিস্ট্রি, ফিনান্স মিনিস্ট্রি, প্ল্যানিং কমিশন ও আরো গোটাকতক ছোট-বড় অফিস ঘুরেও একটা খবর পেলাম না। শেষে ক্লান্ত হয়ে এলাম অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র ক্যান্টিনে সুন্দরী সান্নিধ্যে সস্তায় গোটাকতক ভেজিটেবিল চপ গলাধঃকরণের জন্য। ভাঙা প্লেটে নোংরা চামচ দিয়ে বাজারের সব চাইতে সস্তার আলু-বিট গাজরের চপ খেতে খেতে ভাবছি, অতঃ কিম্? ব্রিফ-লেস ব্যারিস্টার অথবা পসারহীন ডাক্তার ছাড়া সংবাদহীন সাংবাদিকের মনঃকষ্ট উপলব্ধি করা মুস্কিল। অবশ্য অন্যের ক্ষেত্রে সত্য না হলেও সাংবাদিকের ক্ষেত্রে একথা সত্য যে, হোয়ার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে। তাই ভাবছিলাম, রাজধানীর পলিটিক্যাল অবজার্ভার বা সোর্স ক্লোজ টু ডিপ্লোম্যাটিক কোর-এর নামে বড় বড় কাগজের বড় বড় সাংবাদিকদের ধরনে কিছু সংবাদ ম্যানুফ্যাকচার করা যায় কিনা। ব্রেনের মধ্যে বিদ্যুৎতরঙ্গের গতিতে চিন্তার স্রোত দৌড়াদৌড়ি করছে, এক চামচ পচা আলু-বিট-গাজর মুখে পুরে বসে আছি, ঠিক এমন সময় আমার টেবিলের উপর একটা নোংরা চামড়ার ব্যাগ রেখে হাসতে হাসতে পরমেশ্বর পাশের চেয়ারে বসল।

তারপর কি খবর? বহুদিন পরে দেখা তাই না?

'নিজেকেই দেখতে পাই না, আর আপনাদের দেখাই কখন?' হাসতে হাসতেই পরমেশ্বর আক্ষেপ করে—'এমন মানুষের পাল্লায়ও আবার পড়ে! জানটা শেষ করে দিল একেবারে।'

পরমেশ্বরের মনঃকষ্টের কারণটা যে জানি না, তা নয়; তবুও

বললাম, জননেতার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করছেন, এম-পির বাংলোয় বাস করছেন,আবার কি চাই জীবনে ?

বেয়ারা এসে একটা পোড়া পোড়া মসলা দোসা ও স্টেনলেস স্টীলের পাত্রে কফি দিয়ে গেল। এক টুকরো মসলা দোসা ও এক চামচ সম্বব খেতে খেতে পরমেশ্বর বললো, কোশ্চেন কোশ্চেন করে মাথা খেয়ে ফেললো একেবারে। তারপর চাইছেন মোশান-রেজিলিউশন ইত্যাদি ইত্যাদি।

নার্ভাস না হতে উপদেশ দিয়ে পবমেশ্বরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

······উত্তব-পূর্ব ভারতের চায়ের বাগানের মালিক থেকে কংগ্রেসেব নেতা হলেন পরমেশ্বরের 'বস'। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে একলাফে এলেন পার্লামেন্টে। আশু মুখুজ্যে যে কালে চাষী-মজুরকে গ্র্যাজুয়েট কববেন বলে কলকাতা ইউনিভার্সিটি হাতের মুঠোয় রেখেছিলেন সেকালেও ইনি 'এনট্রান্স' এর চৌকাঠ পার হযে আর এগুতে পাবেননি। ধোপতুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি, গান্ধী ক্যাপ ও হাতে একটা চমৎকাব ব্রীফকেস নিযে পার্লামেন্টে আসা আরম্ভ করলেন, কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই উপলব্ধি করলেন নিজের ক্ষমতার দৌড। নগদ বারো টাকা খরচা কবে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, ওয়ানটেড ও স্মার্ট ওয়েল এডুকেটেড পার্ট-টাইম প্রাইভেট সেক্রেটারী ফব এ ওয়েলনোন এম-পি·· ফ্রি ফার্ণিসড্ এ্যাকো-মোডেশন এ্যাণ্ড রেমুনাবেশন এ্যাকর্ডিং টু কোয়ালিফিকেশন। জন তিরিশেক ইন্টারভিউ দিয়ে পাশ করল রাজাগোপালন। সাউথ এভিনিউর এম-পির কোয়ার্টারের তিনতলার বর্ষাতিতে রাজাগোপালন বেশী দিন সুখভোগ করতে পাবল না। মাস তিনেকের মধ্যে অনারেবল মেম্বাব উপলব্ধি করলেন পার্লামেন্টের সব গুরুদায়িত্ব ঠিকমত পালন কবতে হলে পার্ট-টাইম সেক্রেটারী দিয়ে কাজ হবে না। তারপর এলো দুবে, এলো চৌলে, সনাতন ও আরো কয়েক জন। কিন্তু কেউই ধোপে টিকল না। তারপর এলো স্বয়ং পরমেশ্বর ! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন অনারেবল মেম্বার।

সাদা ধবধবে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি গান্ধী টুপি চাপিয়ে হাতে সাপ্লিমেণ্টারী জিজ্ঞাসা করেন, জরুরী সরকারী সংস্থার বার্ষিক বিবরণীর উপর মোশান আনেন, আনেন নানা রেজোলিউশন, করেন বক্তৃতা। মিনিস্টার, ডেপুটি মিনিস্টারের দল হাউস থেকে বেরুবার সময় ধন্যবাদ জানিয়ে যান আমাদের অনারেবল মেম্বারকে। প্রেস গ্যালারিতে বসে বসে বা সেণ্ট্রাল হলের আড্ডাখানায় এমন দৃশ্য আমার নজরে পড়ে আর হাসি পায়।

পরমেশ্বর কোনমতে এক কাপ চা প্লেটে ঢেলে খেয়ে নিয়ে সকাল ছ'টায় অফিস চালু করে। সর্বাগ্রে মর্ণিং পেপার দেখে শর্ট নোটিশ কোশ্চেন তৈরী ও নির্ধারিত প্রশ্নের সাপ্লিমেণ্টারী ঠিক করতে হয়। সাহেবের সইকরা পার্লামেন্টের সবরকম ফর্মই পরমেশ্বরের টেবিলের এক পাশে থাকে। এইসব ফর্মে পরমেশ্বর সাহেবের জন্য কোশ্চেন, রেজোলিউশন, মোশান অফ ডিসকাশন ইত্যাদি ইত্যাদি তৈরী করে দৌড়াবে পার্লামেন্টের নোটিশ অফিসে জমা দেবার জন্য। তারপর ফেরার পথে নিয়ে আসবে সাহেবের পার্লামেণ্টারী কাগজপত্র ডিস্ট্রিবিউশন কাউণ্টার থেকে, হাজার হলেও বিত্তশালী এম-পি কিনা, অই আলতু-ফালতু কাগজপত্রের বাণ্ডিল নিয়ে পার্লামেন্ট হাউস থেকে বেরুতে স্যারের লজ্জা হয়। বাড়ী ফিরেই ডাকের চিঠিপত্র খুলে দেখে পরীক্ষা করে প্রয়োজনে টুকটাক নোট দিয়ে সাহেবের টেবিলে রেখে দেয় পরমেশ্বর। পার্লামেন্ট ও সরকারী কাগজপত্রের জন্য প্রায় শ'খানেক ফাইল রয়েছে; এই ফাইলগুলির নিত্যআহার্য পরমেশ্বরকে পরিবেশন করতে হয়। পার্লামেন্টের ডিবেট বা কোন মিনিস্ট্রির অ্যান্যুয়াল রিপোর্ট এলে কালবিলম্ব না করে ছুটতে হবে বাইণ্ডারের কাছে। ডিবেটের মধ্যে সাহেবের বক্তৃতা না থাকলেও কপিগুলিকে চমৎকারভাবে চামড়ার বাঁধাই করে পরমেশ্বরকে সাজিয়ে রাখতে হয় সাহেবের ড্রয়িংরুমে।

পরমেশ্বরের এইসব নিত্যকর্মপদ্ধতি শেষ করতে না করতেই সাহেব ল্যাঞ্চে আসেন। লাঞ্চ শেষ করেই হাঁক পড়ে, পরমেশ! কাম হিয়ার। আজ কতকগুলো জরুরী চিঠি লেখার আছে জনকতক মিনিস্টারের কাছে......নিজের নির্বাচন এলাকা থেকে বহু চিঠি আসে। সে সব সম্পর্কে চিঠি লেখেন মিনিস্টারদের এবং সেই চিঠির চার কপি করে পরমেশ্বরকে টাইপ করতে হয়ঃ অরিজিন্যাল যাবে মিনিস্টারের কাছে, সেকেণ্ড কপি যাবে সাহেবের ছেলের কাছে কলকাতায়, তৃতীয় কপি যাবে হেড অফিস অর্থাৎ চা-বাগানের ম্যানেজারবাবুর কাছে 'উইথ দি ইন্সট্রাকশন টু ইনফর্ম দি পার্টি কনসার্নড' এবং চতুর্থ কপি 'ফর দিল্লী অফিস'। নিদেন পক্ষে কুড়ি-পঁচিশটা এই ধরনের চিঠি পরমেশ্বরকে নিত্য বেলা দুটো থেকে চারটার মধ্যে টাইপ করে জি-পি-ও'তে গিয়ে পোস্ট করে আসতে হয়। হ্যাঁ আবার ডেসপ্যাচ রেজিস্টার, স্টাম্প এ্যাকাউন্ট তো আছেই।

পরমেশ্বরের সাহেব চা-বাগানের বড়কর্তা কিনা তাই শখ অনেক। কোন সেণ্ট্রাল মিনিস্টার নিজের এলাকায় গেলে তাঁকে নিজ গৃহে রেখে খাইয়ে-দাইয়ে নিজের ভাইঝিকে দিয়ে অন্ততঃ একটা সোলো ডান্স না দেখিয়ে তৃপ্তি পান না। এই ধরণের নিমন্ত্রণপত্র সাহেব নিজে ড্রাফট্ করেন। পরমেশ্বরের স্টাটিস্টিকস অনুযায়ী তার সাহেবের প্রতি ড্রাফটে গড়ে দশ থেকে বারোটা ভুল থাকে; কিন্তু সে ভুল সংশোধনের অধিকার কোন লোকের নেই। দু'একবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখিয়ে দিতে গেলে সাহেব বলেছেন, জান হে পরমেশ, আমার গার্ডেনগুলির সমস্ত করসপনডেন্স আমি নিজে করি; দুঁদে ম্যানেজার ও জাঁদরেল বড়বাবু আজ পর্যন্ত একটা 'কমা' 'সেমিকোলন' বসাতে পারেনি।

মোসাহেবীর হাসি হেসে পরমেশ উত্তর দেয়, আজ্ঞে স্যার টি-গার্ডেনের ইংরেজি শিখলে কি আর আমার কোন দুঃখ থাকত? ওদের স্যার স্ট্যাণ্ডার্ডই আলাদা......আমরা স্যার এম-এ ক্লাসে যে ইংরেজি শিখেছি, আগে সেসব ইংরেজি এনট্রান্সে......

আর এগুতে হয় না পরমেশ্বরকে। আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে সাহেব বলেন, ছাটস্ রাইট পরমেশ .....

সাহেবের ইংরেজি জ্ঞান সম্পর্কে পরমেশ্বর অনেক কাহিনী বলেছে।

বছর তিন-চার আগে এক সেণ্ট্রাল মিনিস্টার সাহেবের এরিয়ায় যাবেন বলে খবর পেতেই সাহেব যথারীতি একটা ইনভিটেশন লেটার ড্রাফট করলেন। অর্ডার হলো টাইপ ইমিডিয়েটলি।

মেম্বার অফ দি হাউস অফ দি পিপ্‌ল লেখা সত্যমেব জয়তে মার্কা প্যাডের পাতা টাইপরাইটারে চড়াল পরমেশ্বর। চিঠিটা বার কতক পড়ে নেয় কিন্তু টাইপ করতে পারে না সে। কন্সট্রাকশনে অনেকগুলো ভুল দেখে পরমেশ চিঠিটা নিয়ে যায় সাহেবের কাছে।

'ড্রাফটটা যে ভাবে আছে, ঠিক সেই ভাবেই টাইপ করব ?'

'ও ইয়েস।'

'কাইণ্ড্‌লি একবার দেখে নিন না।'

দেখে নেন সাহেব ; বলেন, পারফেক্‌টলি অলরাইট।

মুখ টিপে-টিপে হাসতে হাসতে চিঠিটা টাইপ হয়ে গেলে পরমেশ্বরের ; সাহেবের দস্তখত হবার পর চাকর সাইকেল চড়ে ডেলিভারী দিয়ে এলো মিনিস্টারের বাংলোয়।

সন্ধ্যার দিকে একবার টেলিফোন বেজে উঠল।

'দিস্ ইজ প্রাইভেট সেক্রেটারী টু অনারেবল মিনিস্টার ফর··। এম-পি সাব কোঠীমে হ্যায় ?'

'নেহি।' ছোট্ট জবাব দেয়, এম-পি সাহেবের সেক্রেটারী এদিক থেকে।

'কখন ওঁকে পাওয়া যাবে বলতে পারেন ?'

'ঠিক বলতে পারি না ; তবে ইফ ইউ প্লিজ আমাকে বলতে পারেন—আই এ্যাম হিজ প্রাইভেট সেক্রেটারী।'

মিনিস্টারের প্রাইভেট সেক্রেটারী পত্রপ্রাপ্তি জানিয়ে বলেন,

চিঠিটা ঠিক বুঝতে পারলেন না মিনিস্টার; তাই আমাকে টেলিফোন করে খোঁজ নিতে বললেন। কুড ইউ প্লিজ এক্সপ্লেন দি লেটার!

পরমেশ্বর নিজের অক্ষমতার জন্য মার্জনা চাইল; প্রতিশ্রুতি দিল সাহেব এলেই টেলিফোন করতে বলবে। সাহেব ফিরেই টেলিফোন করছিলেন মিনিস্টারের বাড়ীতে কিন্তু উদ্দেশ্য সার্থক হলো না। অবশেষে মিনিস্টার প্রস্তাব করলেন, হোয়াই নট ব্রেকফাস্ট উইথ মি টুমরো এ্যাণ্ড উই উইল ডিস্কাস্ ইওর লেটার।

পরের দিন সকালে উঠে পরমেশ্বরের সাহেব মিনিস্টারের বাড়ী ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়েছিলেন এবং চিঠির বক্তব্য বুঝিয়েছিলেন ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায়।

মিনিস্টার পরমেশ্বর সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। টি গার্ডেনের লেবারদের একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং সন্ধ্যায় বরেণ্য ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে দেখেছিলেন অতিথি-সৎকারকের ভ্রাতুষ্পুত্রীর সোলো ডান্স।

মিনিস্টারসাহেবও অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেননি। বছর খানেক পর এক বিরাট সরকারী অনুষ্ঠানে ডান্স দেখাবার জন্য হাজার দেড়েক মাইল দূর থেকে আনিয়েছিলেন পরমেশ্বরের বসের ভাইঝিকে।

উনত্রিশ

অনেকেই হয়তো জানেন প্রথিতযশা সাহিত্যিক বলেছেন, পাওনাদার ও বীমার দালালের চাইতে সমাজে যদি ভয়ঙ্কর কিছু থাকে, তবে তা খবরের কাগজের রিপোর্টার। কি চমৎকার সার্টিফিকেট বলুন ত! খবরের কাগজের রিপোর্টারের দল ভয়ঙ্কর কিনা জানিনা, তবে কিছুটা নির্লজ্জ হওয়া আমাদের একেবারে বেসিক কোয়ালিফিকেশন। এর পর চাই নরমে-গরমে কাজ হাসিল করার বিদ্যা জানা। কখনও চাঁটি মেরে, কখনও চোখ রাঙিয়ে চলতে হয় আমাদের। ভদ্রতা করার ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময়েই তা

সম্ভব হয় না। তবে বহু ক্ষেত্রে মোসাহেবি তাঁবেদারিও করতে হয়। এক কথায় মোটামুটি মাঝারি ধরনের ভাল অভিনেতা হওয়া দরকার। এক সিনে খুনীর ভূমিকায়, অন্য সিনে প্রেমিকের ভূমিকায়।

দরিয়াগঞ্জের ভিড় ঠেলে এগুবার সময় হঠাৎ উকিলবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পাঞ্জাবীদের রীতি অনুযায়ী হাতে হাত মিলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, খবর সব আচ্ছা হ্যায়?

কৃতজ্ঞতায় গলে যাবার উপক্রম করলাম আমি। হাসি-হাসি মুখে মাথা নীচু করে জানালাম, আপনার দয়ায় মোটামুটি ভালই আছি।

'ঘরকা খবর আচ্ছা হ্যায়?'

'জী হা, বড়ে মেহেরবাণী আপকা।'

স্নেহপরায়ণ উকিলবাবু চা খেতে অনুরোধ জানালেন। সে অনুরোধ এড়িয়ে গেলাম। কিন্তু কালো কোটের ভিতরের পকেট থেকে বের করে একটা কার্ড গুঁজে দিলেন আমার হাতে। বললেন, 'জরুর কভি আনা। আসার আগে একটা টেলিফোন করে সোজা চলে আসবেন।'

'জরুর আউঙ্গা।'

উকিলবাবু ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। আমি কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম; মনে মনে বোধ হয় হেসেও ফেললাম উকিলবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা মনে করে।

……টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছিল সমগ্র পাঞ্জাব। 'সত্‌ শ্রী অকাল' বলে চীৎকার করে লক্ষ লক্ষ শিখ জমায়েত হচ্ছিল অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির ও অন্যান্য গুরুদ্বারের সামনে। বৃদ্ধ মাস্টার তারা সিং-এর নেতৃত্বে পাঞ্জাবী সুবার দাবী উঠল পাঞ্জাবের চারিদিক থেকে। বজ্রমুষ্ঠি তুলে 'পাঞ্জাবী সুবা' আন্দোলন দমনে উদ্যোগী হলেন চীফ মিনিস্টার প্রতাপ সিং কায়রণ। পার্লামেন্টে নেহরু ঘোষণা করলেন অলরেডি ডিভাইডেড্‌, পাঞ্জাব ক্যান নট্‌ বি ডিভাইডেড্‌ এগেন, কাম হোয়াট মে।……পঞ্চনদীর দেশে অশান্তি আরো ছড়িয়ে পড়ল। চিন্তার

কুটিল রেখা ফুটে উঠল নেতৃবৃন্দের ললাটে। অবস্থা চরমে উঠল মাস্টার তারা সিং-এর আমরণ অনশন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে। মাস্টারজীকে বিরত করার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের পবিত্র তীর্থে অশীতিপর বৃদ্ধ মাস্টারজী আমরণ অনশন শুরু করলেন পাঞ্জাবী সুবার দাবীতে। দিল্লী-চণ্ডীগড়-অমৃতসরের মধ্যে দূতের আদান-প্রদান হলো, বিনিময় হলো মতামত, অনুরোধ-উপরোধ। কিছুই হলো না। মাস্টারজীর হেলথ্ বুলেটিনে উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হলো। অভাবিত ভবিষ্যতের চিন্তায় চাঞ্চল্য দেখা দিল বহু দিকে। কায়রণ ছুটে এলেন দিল্লী; সলা-পরামর্শ করলেন নেহরু ও পন্থজীর সঙ্গে।

শেষ প্রায় চরম মুহূর্তে নেহরুর ব্যক্তিগত ও একান্ত অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করলেন মাস্টারজী। বৃদ্ধ মাস্টারজীর প্রাণরক্ষায় সন্তোষ প্রকাশ করলেন সবাই। শুধু পাঞ্জাব নয়, সমগ্র দেশবাসী সাধুবাদ জানালেন নেহরুকে। দিল্লী থেকে নেহরু চলে গেলেন ভবনগর কংগ্রেসে। ভবনগরে আলোচনার জন্য নেহরু আমন্ত্রণ জানালেন মাস্টারজীকে।

নেহরু ও অসংখ্য দেশবাসীর মত আমরাও ভবনগর কংগ্রেসে গিয়ে মহা উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছিলাম মাস্টারজীর জন্য। অনেক খোঁজখবর করে জানা গেল, স্পেশ্যাল প্লেনে মাস্টারজী আসছেন ভবনগর। কিন্তু সঠিক ক'টার সময় তাঁর প্লেন ল্যাণ্ড করছে ও কোন্ সময় নেহরু-তারা সিং সাক্ষাৎকার হবে তা জানা গেল না।

প্রথম কি দ্বিতীয় দিন হবে; এ-আই-সি-সি'র প্রাতঃকালীন অধিবেশন শেষ হলো। একটু ফাঁকা পেয়ে মোরারজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, মাস্টারজী কখন আসছেন?

'মাস্টারজীর প্লেন তো ঘণ্টা দুই আগেই এসে গেছে এবং এতক্ষণে পণ্ডিতজীর সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনাও শেষ হলো বোধ হয়।'

সর্বনাশ! এক দৌড়ে প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

এসে দেখি পন্থজী তাঁর গাড়ীর দিকে এগুচ্ছেন। দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড……।

হাতের ঘড়ির দিকে এক নজর দেখে নিলেন পন্থজী। বললেন, আই থিঙ্ক দেয়ার টকস্ আর ওভার। ইন এনি কেস, ইউ যাস্ট রাশ অন, হ্যাভ এ ট্রাই।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। চারদিক চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলাম। হ্যাভ এ ট্রাই মানে একটা রিক্সায় চড়ে পড়া ছাড়া আর কিছু সম্ভব নয় ভবনগরে। আমার অসহায় অবস্থা দেখে পন্থজীর মন ভিজল। 'গেট ইন।'

ভবনগর রাজবাড়ীর রোলস রয়েসে চড়ে বসলাম পন্থজীব ঔদার্যে। গাড়ী চলল ভবনগর রাজপ্রসাদের দিকে। (নেহরু ও পন্থজীই কেবল মহারাজার অতিথিরূপে রাজপ্রাসাদে ছিলেন; আর সবাইকে কংগ্রেস নগরের চাটাই-এব ঘরে বন্দী থাকতে হয়েছিল।) শহর শেষ হলো, গাড়ী ফাঁকা রাস্তা দিয়ে অনেক দূর এগুল; তারপর ঢুকল একটা বিরাট বাগিচার মধ্যে। গাড়ীতে বসে বসেই ডানে-বাঁয়ে ছোট-বড় নানা সাইজের ও ডিজাইনেব রাজবাড়ীর মত প্রাসাদ নজরে পড়ল। জানকীকে জিজ্ঞাসা করলে জানাল, এগুলো রাজবাড়ী; তবে আমরা চলেছি মেন প্রাসাদে। অসংখ্য গাছপালা লতাপাতার মধ্য দিয়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে গাড়ী যেন প্রাসাদেব সামনে হাজির হলো। পন্থজী নেমে ডান দিক দিয়ে উপবে উঠে গেলেন। জানকী আমাকে সোজা উপরে উঠে যেতে বললো।

সিঁড়ি ভেঙে উপরের বারান্দায় হাজির হতেই দেখি, আমার এক স্বজাতি মহা উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে। প্রায় চীৎকার করে বললো, হাউ কুড্ ইউ কাম হিয়ার…অর্থাৎ এতবড় বাগানের মধ্যে এতগুলো ডুপ্লিকেট রাজবাড়ী এড়িয়ে এখানে হাজির হলে কি করে?

মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এলাম।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখলাম নেহরু মাস্টারজীর হাত ধরে

বারান্দা অবধি পৌঁছে দিয়ে গেলেন। মাস্টারজীর পিছন পিছন এলেন কালো কোট পরে এক বাণ্ডিল কাগজ হাতে এক উকিলবাবু।

মাস্টারজী বারান্দায় পৌঁছতেই আমরা দুজনে তাঁর হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। গুণমুগ্ধ ভক্তের মত বিগলিত কণ্ঠে বললাম, আপনার এই বয়সে এমন স্বাস্থ্য নিয়ে এতদূর আসতে না জানি কি কষ্টই হলো?

মন্দ্রিত কণ্ঠে মাস্টারজী পরম স্নেহের সঙ্গে বললেন, হাঁ বেটা, কিয়া করুঙ্গা?

স্বগতোক্তি করল আমার বন্ধু, আপনার মত আর কয়েকজন লোক থাকলেই দেশের চেহারাই বদলে যেত।

দুজনে মাস্টারজীর দুদিক ধরে আসতে আসতে একটা চেয়ারে বসালাম। সবিনয় নিবেদনমিদং করে জিজ্ঞাসা করলাম, সারা দেশ আজ আপনার খবরের জন্য অতীব আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কথাবার্তায় কিছু ফল হলো?

দাড়ি নাড়িয়ে মাস্টারজী বললেন, নেই বেটা ইধার কুছ নেহি কহুঙ্গা······দিল্লী লোটনেকা বাদ······।

সর্বনাশ! এখানে কিছুই বলবেন না?

হঠাৎ যেন কোথা থেকে মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। সেণ্ট পার্সেণ্ট পাঞ্জাবীদের মত বললাম, কৈ বাত নেই! আর কাল বিলম্ব নয়। এক চোখে বন্ধুকে ইশারা করে দুজনে যুগপৎ মাস্টারজীর গা-হাত-পা মালিশ শুরু করলাম। দুজনেই প্রাণমন সমর্পণ করে মাস্টারজীর পদসেবা করতে লাগলাম। উকিলবাবু হাঁ করে গাড়ীর জন্য বাইরের দিকে তাকিয়ে। কয়েক মিনিট কেটে গেল। হঠাৎ মাস্টারজী একটু নড়েচড়ে ঘুরে বসলেন, বুঝলাম পিছন দিকটা টিপতে বলছেন। দুই বন্ধুর ইসারা বিনিময় হলো; শুরু হলো কাঁধ-পিঠ টেপা।

কয়েক মিনিট বাদে মাস্টারজী চমকে দিলেন: বলে উঠলেন, উকিল-সাব, দো বেটাকো দো কপি দে দো······!

উকিলবাবু যেন আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন। নেহি বাবুজি,

দিল্লীতে আমাদের জন্য বহু প্রেসম্যান অপেক্ষা করছে।……তাছাড়া শতাধিক ফরেন করস্‌পন্‌ডেন্ট ও রেডিও-টেলিভিসন রিপ্রেসন্‌টেটিভ নিশ্চয়ই পার্লামে এসে বসে আছে।

মাস্টারজী বললেন, কৈ বাত নেই; দুই 'বেটাকে' দুটি কপি দিয়ে দাও।

আমরা যেন কিছুই শুনিনি; নির্বিকারচিত্তে গুরুসেবা করে চলেছি। উকিলবাবু নিঃশব্দে ব্যাগ থেকে দুটি কপি বের করে আমাদের হাতে তুলে দিলেন।

ইতিমধ্যে মাস্টারজীর গাড়ী এসে গেছে। মিশনারী হাসপাতালের নার্সের মত আমরা দুজনে সন্তর্পণে ও সযত্নে মাস্টারজীকে ধরে নিয়ে গাড়ীতে চড়িয়ে দিলাম। হাঁটু ছুঁয়ে দুজনেই মাস্টারজীকে প্রণাম করলাম। 'গেট ইন', গেট ইন', বলে উকিলবাবুকে এক ধাক্কা মেরে গাড়ীতে ঠেলে দিলাম। উকিলবাবুর বোধহয় একটু আঘাতই লেগেছিল। কটমট করে তাকিয়ে আমাদের কিছু বলবার পূর্বেই উর্দিপরা ড্রাইভার এ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়েছে। ছেলেবেলার দুষ্টুমিবুদ্ধি আবার মাথায় চাপল; উকিলবাবুর দিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালাম।

হাসতে হাসতে দুজনে দুটি কপি নিয়ে দৌড় মারলাম কংগ্রেস নগরের উদ্দেশ্যে। কালবিলম্ব না করে প্রেসরুমে এসে টাইপ করে নেহরু-তারা সিং টকের ব্যর্থতার খবর পাঠালাম আমাদের নিজের নিজের কাগজে। অন্য সাংবাদিকরা মাস্টার তারা সিং-এর হদিশ পাবার আগেই তাঁর স্পেশ্যাল প্লেন ভবনগর ছেড়ে দিল্লীর পথে উড়েছিল।

সেবার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, যে খবরের অধিকারী হতে চলেছিলাম আমরা, উকিলবাবু তারই অন্তরায় হতে চলেছিলেন। সেজন্য তাঁর উপর ঠিক সন্তুষ্ট থাকতে পারিনি। পরে দিল্লীতে উকিলবাবুর যে মূর্তি দেখেছিলাম, তাতে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু কি করব, প্রথম আলাপের সেই প্রণয় মধুর মুহূর্তটি আজও ভুলতে পারি না।

ত্রিশ

পার্লামেণ্টের সেই একঘেয়ে বক্তৃতা, সেণ্ট্রাল হলের কফি আর পরনিন্দার মহাভারত শুনতে শুনতে মাঝে মাঝেই হাঁপিয়ে উঠতে হয়। মনটা উড়ু উড়ু করে; অথচ লাটাই-বাঁধা ঘুড়ির মত পার্লামেণ্টকে কেন্দ্র করে একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ করতেই হয়...'দুঃখের বর্ষায় চক্ষের জল যেই নামল, বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।'

.. ঔরঙ্গজেব রোড থেকে ইমারজেন্সী নিমন্ত্রণ আসে; তোয়ালে হাতে নিয়ে ছুট দিই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভি-আই-পি বন্ধুর সাহচর্যে হাজির হই অশোকা হোটেলের সুইমিং হলে।

ইতস্তত বিদেশী টুরিস্ট-বিধ্বস্ত ব্যালকনিতে বসে এক কাপ চা আর গোটাকতক গোল্ডফ্লেক উড়িয়ে দুজনে রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে এক নজরে দেখে নিই সুইমিং পুলের দৃশ্যটা। সাধারণতঃ এখানে কিছু ডিপ্লোম্যাট ও কিছু ফরেন ট্যুরিস্টই নজরে পড়ে। মাঝে মাঝে দু'চারজন পঞ্চনদী পাড়ের সর্দারজীদের বেণী বাঁচিয়ে সাঁতার কাটতে দেখা যায়; আর পাওয়া যায় জনকয়েক এলিজাবেথ টেলরের ভারতীয় সংস্করণ। রঙীন মন নিয়ে অশোকা হোটেলের সুইমিং পুলের নীল জলে নামার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এইসব ভারতীয় এলিজাবেথ টেলরের দল প্রায় শাড়ীর সমতুল্য দীর্ঘ তোয়ালে জড়িয়ে বিচরণ করেন। তারপর তোয়ালে ত্যাগ করে বিদ্যুৎবেগে হুড়মুড় করে নামেন জলে। আলট্রা মডার্ণ হয়েও সংস্কারমুক্ত হওয়া যে সহজ নয়, সে কথা এঁদের দেখে বেশ বোঝা যায়। সুইমিং পুল সংলগ্ন ছোট্ট লনটির দৃশ্যের সঙ্গে বেইরুট-বীচের দৃশ্যের সঙ্গে কোন পার্থক্য নজরে পড়বে না। টু-পিস্ বা থ্রি-পিস সুইমিং কস্‌টিউম পরে উদ্ধত যৌবন দেখিয়ে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেন 'চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী'র দল। কখনও কখনও বা এঁদের দেখা যায় শায়িত পুরুষের পাশে কোকাকোলার বিজ্ঞাপনের মত চোখে

সান গ্লাস দিয়ে হেলেদুলে বাঁকা হয়ে বসে পকেট-বুক সিরিজের বই পড়তে। আর নজরে পড়ে বৃদ্ধা মেমের কচি বাচ্চার সাঁতারকাটা। শীতের দেশে জন্মেও শৈশবে কিভাবে জলের সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব করল, তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।

দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকার পর বন্ধুবর কোনক্রমে তাঁর ছত্রিশ ইঞ্চি বক্ষ উন্মুক্ত করে জলে নামেন। নির্লজ্জ বলে আমাব খ্যাতি থাকলেও দেহের আবরণ উন্মোচনে আমাব ভীষণ লজ্জা! আরো গোটাকতক পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনা শেষ হবাব পব আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং কুতব-মিনার সমান উঁচু হলে প্রচুব আহার-বিহার উপভোগ করার পর দেহটি দেখবার মত না হওয়া পর্যন্ত আমাকে এই বকম সুইমিং পুলের ব্যালকনিতে বসেই কাটাতে হবে। তবে বসে বসে যে দৃশ্য দেখি তা সেন্সব বোর্ডের নির্মমতার জন্য কোন দেশী ফিল্মেও দেখা সম্ভব নয়।

একদিন পার্লামেণ্ট পালিযে মুষলধারে বৃষ্টিব মধ্যে দুজনে হাজির হলাম অশোকা হোটেলেব সুইমিং পুলে। শুধু আমবা দুটি প্রাণী ছাড়া আর কোন সুইমার নজরে পডল না। বন্ধু জলে নামলেন। আমি বসে বসে দেখি 'বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ়' এলো নেমে। চারদিক ফাঁকা দেখে হয়ত বা মনে মনে গুণগুনই করছিলাম। হঠাৎ চোখেব সামনে লনেব মধ্যে দুটি মূর্তি ভেসে উঠল। সাঁতার না কাটলেও সুইমিং কস্‌টিউম পরে দুজনকে প্রায় ক্লার্ক গেবল-সুসান হেওয়ার্ডের মত একত্রে ছোটাছুটি করতে দেখলাম। ঝাপসা ঝাপসা হলেও বুঝলাম এঁরা আমার স্বজাতি; অর্থাৎ বঙ্গ-ভাষাভাষী। সর্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি নিয়ে সিক্ত বসনে ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী যখন আমাব পাশ দিয়ে ব্যালকনিব কোণে চেঞ্জিং-রুমে চলে গেলেন, তখন নিজের অজ্ঞাতেই আমাব মুখে হাসির বেখা ফুটে উঠল। ভাবি 'একি কৌতুক নিত্য নতুন ওগো কৌতুকময়ী'?

বাংলার এক পুরুষসিংহের রক্ত মেয়েটির ধমনীতে আছে বলে জেনেছিলাম প্রথম দর্শনেব দিন। সে আজ দীর্ঘদিন পূর্বেকার কথা।

তেরো-চৌদ্দ বছর আগে দেখেছিলাম চঞ্চলা যুবতীরূপে; আজও তিনি 'নহ মাতা, নহ কন্যা, সুন্দরী রূপসী'। শুধু দুটি চোখের কোণে গভীর কালো রেখা পড়ে গেছে। প্রসাধনের জোরে প্রৌঢ়ত্বের মাঝে দাঁড়িয়েও উর্বশী সুন্দরী উদ্ধতভাবে গর্বিত যৌবনের ধ্বজা উড়িয়ে চলেছেন। বিয়ে? ছিঃ হোয়াট এ সিলি আইডিয়া! শেষে বাঁদী-দাসী হয়ে কপালে সিঁদুর পরে বন্দিনী জীবনের ঢাক বাজাবেন ইনি! এহ বাহ্য··· । তাইতো শ্রীমতী এখনও দিনের আলোয় বান্ধবী, রাতের আঁধারে মর্মসহচরীর ভূমিকায় নিত্যনতুন মঞ্চে অভিনয় করে চলেছেন।

ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে ঘুরছিলাম সারা ভারতবর্ষ কুইনস্ প্রেস পার্টির মেম্বার হয়ে। ঘুরতে ঘুরতে আমরা এলাম একদা এক দেশীয় রাজ্যের পুণ্যতীর্থে। সারাদিন ছোটাছুটি করে সন্ধ্যার পর টাইপ-রাইটার খটাখট করে প্রেস-মেসেজগুলো পাঠিয়ে দিয়ে হোটেলের মুখ দেখলাম। স্নান করে স্নো, পাউডার মেখে কালো স্যুট চাপিয়ে যখন রিসেপ্‌সনে হাজির হলাম, তখন রাত্রি প্রায় ন'টা। প্রাসাদ-বাড়ীর সেই মনোরম গৃহের চারিদিকে ওমর খৈয়ামের মন-মাতানো তৈল-চিত্র। মাথার উপর ঝাড়লণ্ঠন আর চরণ-যুগলের তলায় পারসিয়ান কার্পেট রেখে বিচরণ করছিলেন আধুনিক ওমর খৈয়ামের দল! ভিড়ের মধ্যে পাশ কাটিয়ে বিচরণ করতে করতে সোফিয়া লরেনের মত আলুথালু দেখলাম বাংলা দেশের সেই পুরুষসিংহের এই বংশধারিণীকেই। চোখের পাতা বেশ ভারী ভারী লাগল; মনে হল বেশ কয়েক রাউণ্ড হয়ে গেছে। রাজন্যসমাবেশে আমার মত কোন সুতানুটি-গোবিন্দপুরবাসী থাকতে পারে, একথা নিশ্চয়ই শ্রীমতী প্রত্যাশা করেননি। তাই নির্লিপ্তভাবে নির্বিকারচিত্তে এক চুমুকে গেলাসের তলানিটুকুও শেষ করে হাঁক দিচ্ছিলেন, বেয়ারা-আ-আ, অর এক বড়া লেআও।

পার্টি কতক্ষণ চলেছিল জানি না। রাত একটা নাগাদ ঘরে ফেরার সময় শ্রীমতীকে নেশার ঘোরে জনকয়েক কেতাদুরস্ত দেশী

সাহেবের সঙ্গে অর্ধেক শাড়ী ত্যাগ করে হাত তুলে ঘুরে ঘুরে স্প্যানিস ডান্স করতে দেখলাম। বাকি রাতটুকু কিভাবে ও কোথায় কাটিয়েছিলেন জানি না।

পরের দিন সকালে ডাইনিং হলে ব্রেকফাস্ট খেতে গেলে দেখলাম গত রাত্রের স্প্যানিস ডান্সারকে। দামী শাড়ী পরেছেন, সযত্নে প্রসাধন করেছেন, কিন্তু তবু বেশ বোঝা যায় সারারাত্রিব্যাপী সাইক্লোন বয়ে গেছে তাঁর উপর দিয়ে।

পরিচয় না দিয়ে পাশে গিয়ে শুধু বললাম, মর্ণিং···হাউ ওয়াজ লাস্ট নাইট ?

মুচকি হেসে বললেন, ওয়াণ্ডারফুল। অনেকদিন বাদে অশোকা হোটেলের সুইমিং পুলে এঁকেই বৃষ্টির নূপুরের সঙ্গে জীবননাট্যের নৃত্য করতে দেখলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিকই বলেছেন, 'লণ্ঠনের চারিদিকে আলো, তলাটাই কালো'।···পুরুষসিংহ ব্যক্তির বংশোদ্ভুতা মহিলাটি ইতিহাসের সম্মান রেখেছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ।

একত্রিশ

কদিন আগে এক্সটারন্যাল এ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রীর এক প্রেস রিলিজ বেরিয়েছিল জাকর্তার মার্দেকা প্যালেসে স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উৎসবের এক অনুষ্ঠান সম্পর্কে। দিল্লীর ধনুর্ধর স্পেশ্যাল করসপনডেণ্ট বাহিনীর কারো সে রিলিজে নজর পড়েনি নিশ্চয়ই। সরকারী প্রেসনোট, পার্লামেণ্টের বক্তৃতা আর নিত্য-নৈমিত্তিক সরকারী-বেসরকারী ব্রিফিং-এর খবর ছাড়া যেন আর কোন খবর কাগজে পাঠান যায় তা দিল্লী সাংবাদিকরা জানেন কিনা জানিনে। তাই তো মার্দেকা প্যালেসের সে খবর কোন কাগজে বেরুল না, এমন কি কলকাতার কোন উল্লেখযোগ্য কাগজেও নয়।

মার্দেকা প্যালেসের ঐ অনুষ্ঠানে ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সোয়েকর্ণ। কালেকটেড অয়ার্কস অফ বিবেকানন্দ

গ্রহণ করে ডাঃ সোয়েকর্ণ সেদিন যে কথা বলেছেন, তা অনেক ভারতবাসীর মুখেই শোনা যায় না। বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী হাতে পেয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই বহু আলোচিত নেতা ফিরে পেয়েছিলেন তাঁর অতীত স্মৃতি, চমকে দিয়েছিলেন উপস্থিত ভারতবাসীদের।

যৌবনের প্রারম্ভে স্বামীজীর পৌরুষ ও কর্মসম্পাদনের বাণী আমাকে অভিভূত করে তোলে। জীবনের বহু আনন্দকে বিসর্জন দিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি, সংগ্রাম করেছি ইন্দোনেশিয়ার মানুষকে এক পতাকার তলায় আনবার জন্য।...ডাচ প্রভুদের কারাগারে গেছি, ঘুরেছি বনেজঙ্গলে আত্মগোপন করে, কিন্তু দেশবাসীর উপর বিশ্বাস হারাইনি, অবিশ্বাস করিনি নিজের আত্মবিশ্বাসকে। ...স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম মহাপুরুষ যিনি আমাকে দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রমে নিত্য অনুপ্রেরিত করেছেন তাঁর বাণীর মধ্য দিয়ে।

প্রেসিডেণ্ট সোয়েকর্ণ আরো অনেক কিছু বলেছিলেন।

ইন্দোনেশীয় ভাষায় বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী বেরিয়েছে। ভূমিকা লিখেছেন স্বয়ং ডাঃ সোয়েকর্ণ।... 'স্বামী বিবেকানন্দ! কি আশ্চর্য এই নাম! ইনি একজন, যিনি আমাকে না জানি কত অনুপ্রেরণা দিয়েছেন,—অনুপ্রেরণা দিয়েছেন শক্তিশালী হবার জন্য, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন ভগবানের দাস হতে, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন আমার দেশের সেবা করতে, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন দরিদ্রের সেবক হতে, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন মনুষ্যত্বের পূজারী হতে।..ইনিই সেই মহাপুরুষ যিনি বলেছিলেন, আমরা বহু অশ্রু বিসর্জন করেছি, আর নয়; নিজের অধিকারে নিজে দাঁড়াও ও মানুষ হও।'

শুধু কি তাই? সোয়েকর্ণ তাঁর চিরতারুণ্যের কারণ বলে চমকে দিয়েছিলেন উপস্থিত ভারতীয়দের। বলেছিলেন, কর্মক্লান্ত দিনের শেষে প্রতি রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্বে স্বামীজির বাণীর কয়েক লাইন পড়ি; সে বাণী আমার জীবন থেকে সব ক্লান্তি দূর করে আনে চিরতারুণ্যের বন্যা!

রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে ডাঃ সোয়েকর্ণের সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে; কিন্তু বহু দূরের ধর্মাবলম্বী এক রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও স্বামীজির প্রতি সোয়েকর্ণের অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকার জন্য আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লজ্জারও কারণ আছে। বাংলাদেশে জন্মে, বাংলাদেশের জল-হাওয়ায় প্রতিপালিত হয়ে, সিমুলিয়া স্ট্রীট আর দক্ষিণেশ্বর-বেলুড়ের চারপাশে ঘোরাঘুরি করেও সাড়ে তিন কোটি বাঙালীর ক'জন আজ পর্যন্ত বিবেকানন্দকে চিনতে পেরেছি? রত্নগর্ভা বাংলার ছেলে বীরেশ্বরে বিবেকানন্দের জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি, কিন্তু তাঁর সত্যকার অনুরাগীর সংখ্যা প্রকাশ করতে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে আমরা ঢলে গলে পড়ি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা মুখস্থ বলতে পারি, আমাদের মধ্যে এমন বাঙালীর সংখ্যা সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে ধরাও মুস্কিল। দুঃখের বিষয় বিবেকানন্দের বেলাতেও বাঙালীর শ্রদ্ধা অনুরূপই হবে।

বাংলাদেশের বাঙালীরা তবু বিবেকানন্দকে একেবারে ভুলতে পারেনি নানা কারণে। দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশনেও যে স্বামীজির কিছু ভক্তের মিলন হয় না, তা নয়; তবে তা উল্লেখযোগ্য নয়। বারোশ' টাকার আণ্ডার সেক্রেটারী মিনিস্টার-সেক্রেটারীর মোসাহেব আর গিন্নীর তাঁবেদারী করেই কুলিয়ে উঠতে পারে না, তা আবার বিবেকানন্দ! সারা দিল্লীর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হাজার বাঙালীর মধ্যে ক'জনের বাড়ীতে স্বামীজির একখানি আট আনা দামের 'চিকাগো বক্তৃতা' পাওয়া যাবে-তার খোঁজ করতে বছর কাবার হয়ে যাবে। ক্যাপিটালের বাঙালীর ব্যাপারই আলাদা! ড্রয়িংরুম সাজিয়ে লাঞ্চ-ডিনার-ককটেল ঠিক রেখে, রাজধানীর বাঙালী-অবাঙালী সাহেব-মেমসাহেবদের বিবেকানন্দকে মনে করবার সময় কোথা?

ভারতবর্ষের রাজধানী হলেও, ধর্ম-সংস্কৃতির দিক থেকে দিল্লী ভারতবর্ষ থেকে বহু দূরে। ইণ্ডিয়ান কালচারের লেকচার ছড়ান হয় দিল্লী থেকে, কিন্তু রাজধানীর জীবনে ইণ্ডিয়ান ট্র্যাডিশনের বালাই

নেই। এখানে গঙ্গাজলের চাইতে হুইস্কি পবিত্র বেশী, শাড়ী পরেও বিদেশিনীদের চাইতেও অতিরিক্ত অঙ্গ-মাধুর্য দেখাবার প্রতি রাজধানীর ললনাকুলের আগ্রহ বেশী। এই দুনিয়ার বাইরে যাঁরা, তাঁদের ধর্ম পলিটিক্স, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে শুধু পলিটিক্স। কিন্তু এই পলিটিক্স-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই হঠাৎ আবার একদিন বিস্ময় দেখা দিয়েছিল।

শীতের সকালে ওভারকোট চাপিয়ে যখন সাতনম্বর ত্যাগরাজ রোডের ছোট্ট বাংলোয় হাজির হলাম, তখন মোরারজীর স্নান সেরে চরকা কাটা সবে শেষ হচ্ছে। বিদেশী সভ্যতার অনুকরণে সোফা-কার্পেট মোরারজীর অন্দরমহলে অস্পৃশ্য; নাতি-বিস্তীর্ণ ঘরের বৃহত্তর অংশ জুড়ে গদী-তাকিয়া। তারই উপর বসলাম। একগাদা খবরের কাগজ আর দেশী-বিদেশী পত্রপত্রিকার নীচ থেকে বের করলেন ডাঃ ভূপেন্দ্র দত্তের 'স্বামী বিবেকানন্দ: প্যাট্রিয়ট-প্রফেট'।

বললেন, ডঃ দত্তের এই বইখানা আজ পর্যন্ত যে কতবার পড়লাম, তার হিসেব নেই। কিন্তু তবু মনে হয়, স্বামীজিকে যেন নতুন করে সামনে পাচ্ছি প্রতিবার।

হাতের কাছেই আট ভলিউমের স্বামীজির কমপ্লিট ওয়ার্কস ছিল। বইগুলোকে দেখিয়ে বললেন, তোমরা তো মডার্ণ যুগের ছেলে; ভারতবর্ষ সম্পর্কে না জানি কত বই পড়েছ, কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাঁচ হাজার বছরের ভারতবর্ষের পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে এই তরুণ সন্ন্যাসীর কৃপা ছাড়া গতি নেই। একটু পাশ ফিরে বসে তাকিয়ায় হেলান দিলেন। এক ভলিউম তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, অনেকে হয়ত জানে না, এই ভারতপথিক সন্ন্যাসীই আমাকে চরম পরীক্ষায় বাঁচিয়েছেন। ...গান্ধীজির আহ্বানে বারো বছরের সরকারী চাকরি ছেড়েছিলাম উনিশ শ' তিরিশে। তখন সারা দেশে এক পাগলামীর হাওয়া বইছিল, গান্ধীজি চল্লিশ কোটির এই দেশকে পাগল করে তুলেছিলেন

স্বাধীনতার জন্য। সে ঝড়ে আমিও ঝাঁপ দিয়েছিলাম; পরে গান্ধীজির সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছিলাম।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। দু' একটা কথা বলে নামিয়ে রাখলেন। আবার বললেন, উনিশ শ' তিরিশেই প্রথম জেলে গেলাম। প্রথম প্রথম মনটা বড় অশান্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু শান্তি পেলাম সেই সন্ন্যাসীর কৃপায়। এক সহকর্মী আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন স্বামীজির খানকতক বই। চঞ্চল মন হঠাৎ যেন যাদুস্পর্শে শান্ত হয়ে গেল। কি যেন মনে হলো, কয়েকবার করে পড়ে ফেললাম বইগুলো। মনে হলো, জেলাখানার মধ্যে বন্দী হয়েও আমি মুক্ত, আমি এসে দাঁড়িয়েছি ভারতবর্ষের জনারণ্যের মধ্যে।

শুধু কি তাই? ভারতবর্ষের মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছেন বিবেকানন্দ।

মোরারজী বলছিলেন, ভারতবর্ষে না জানি কত লক্ষ সন্ন্যাসী জন্মেছেন, কিন্তু কোন্ সন্ন্যাসী বলেছেন, যে ধম গবীবের দুঃখ দূব করে না, মানুষকে দেবতা করে না, সে কী ধর্ম? ভারতবর্ষের মানুষ ধর্ম পালন করে শুধু মানুষকে অপমান করাব জন্য, অপরকে ছোট কবে নিজেকে মহৎ কবাব জন্য, মানুষের মধ্যে মিলন ঘটাবার জন্য নয়, শুধু প্রভেদ সৃষ্টিব জন্য। আজ চারিদিকে হাজার হাজার বক্তৃতায় যে কথাটি সব চাইতে বেশী শোনা যায় সেই Unity in diversity বিবেকানন্দই প্রথম বলেছিলেন।

একটু থামলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, তুমি তো বাঙালী; তুমি নিশ্চয়ই জান বাংলাদেশের যুগান্তর পার্টিব কর্মীরা, সন্ত্রাসবাদী তরুণ বাঙালী ছেলেবা ইংরেজের ফাঁসির ভয় অগ্রাহ্য করেছিল শুধু এই বীর সন্ন্যাসীর অনুপ্রেরণায়।····· মানিকতলার বোমার মামলাব কাবখানায় স্বামীজির ফটো পূজা করা হতো, তাই না?

মোরারজীর সমালোচনা অনেকেই কবেন; হয়ত তার কারণও আছে। কিন্তু সবাই হয়ত জানেন না মোরারজীর চাইতে নির্ভীক স্পষ্টবক্তা রাজনৈতিক নেতা আজ বোধকরি আর নেই। মাঝে মাঝে

নিজের মনেই প্রশ্ন করছি, এটা কি স্বামীজির প্রভাবের পরিচয় নয়? দিল্লীর এই রাজনৈতিক দুনিয়ার আড়ালে আর একজনকে বিবেকানন্দের অনুরাগী দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম।

কৃষ্ণ মেননের দু'খানি ঘরের আবাসস্থানে মাটি থেকে ছাদ পর্যন্ত শুধু বই। দেওয়াল দেখা যায় না বললেই চলে। শুনেছি জিন্নার পর এমন ভোরেসিয়াস রিডার আর রাজনৈতিক দুনিয়ায় দেখা যায় নি। সারা দিনরাত্রি বই পড়েন জানি, কিন্তু তাই বলে ধর্মের বই?

ঘুরে ঘুরে সেলফ'এর বইগুলো দেখছিলাম। হঠাৎ এক জায়গায় বিবেকানন্দের একগাদা কালেকশন দেখলাম; তাঁর বাঁ দিকে সিস্টার নিবেদিতার The Master As I Saw Him, The Web of Indian Life, রোঁমা রোলার 'লাইফ অফ স্বামি বিবেকানন্দ' এবং আরো অনেক।

এমন নিরেট পলিটিসিয়ানের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের এত বই দেখে একটু বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। নিজের অজ্ঞাতসারেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, একি, আপনার কাছে এতগুলো রিলিজিয়াস বই?

ছড়ি দিয়ে আমার গলাটা টেনে ধরে বললেন, ইউ ননসেন্স! বিবেকানন্দ আবার রিলিজিয়াস লীডার ছিলেন নাকি?

আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম।

মেনন বললেন, স্বামীজি ওয়াজ এ রিয়াল প্যাট্রিয়ট অ্যাণ্ড এ পিওর ইণ্ডিয়ান।

তাতো বটেই।

ড্যাম ইওর তাতো বটেই। আর দুঃখ হয় যে, আমাদের দেশে গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হয় এবং তার আর সব দোষ, সব গুণ ঢেকে যায়। বিবেকানন্দের চাইতে গ্রেটার সোস্যালিস্ট ভারতে জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। সংসার ত্যাগ করে গেরুয়া পরেও, বিবেকানন্দ একজন যিনি সংসারকে ভোলেন নি; তাইতো তিনি বলতে পেরেছিলেন, Freedom is the first condition of growth.

সেলফ থেকে কয়েকখানা বই বাছতে বাছতে বললেন, অদ্বৈত-দর্শনের দেশ ভারতবর্ষ। কলেজের লেকচারার, মঠ-মন্দিরের সাধু-বাবার দল ও দার্শনিক অদ্বৈত-দর্শনের থিওরি আওড়াতেই ব্যস্ত। কিন্তু বিবেকানন্দই একমাত্র মহাপুরুষ যিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন, The work of Advaita philosophy is to breakdown all privileges.

হাতের বইগুলোর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কালেকটেড ওয়ার্কস'এর বেদান্ত এ্যাণ্ড প্রিভিলেজ চ্যাপটার বের করে বললেন, দেখ কি লিখেছেন; লিখেছেন……"Religion goes down where priest-craft arises' সত্যি কি?

একেবারে সত্যি।

শুধু আমাদের দেশের ক্ষেত্রে নয়, একথা সর্বদেশে সত্য। ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়েছ? দেখনি যখনই চার্চ বেশী পাওয়ারফুল হয়ে উঠেছে, তখনই দেশে নানা অনাচার-অবিচার হয়েছে, আর ধর্ম গোল্লায় গেছে।

হাতে একগাদা বিবেকানন্দের বই নিয়ে বসে পড়লেন কৃষ্ণ মেনন। আনমনে বলতে লাগলেন, বিবেকানন্দ সব কিছু ছিলেন, এমন কি একজন গ্রেট হিস্টোরিয়ান টু; তা নাহলে কেউ বলতে পারে, 'No Progress is in a straight line,' ইতিহাসের কত বড় ছাত্র হলে তবে বিশ্বইতিহাসের এমন ফরমুলা বের করা যায়!

একজন ভিজিটার্সের স্লিপ এলো। আমি উঠে দাঁড়ালাম। যাবার মুখে আমাকে বললেন, মাই ডিয়ার ইয়ং ম্যান, বিবেকানন্দকে পড়, কামধেনুর মত এর মধ্যে সবকিছু পাবে।

বত্রিশ

মহামতি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের মহাভারতের মত স্বাধীন ভারতের দুর্নীতি নিয়েও নাকি অনুরূপ এক বা একাধিক মহাকাব্য লেখা যায়। রাজনৈতিক দুনিয়ার সবাই দুর্নীতিপরায়ণ, একথা সত্য নয়। পরলোকগত ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জির সঙ্গে যাঁদের একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁদের অনেকেই হয়ত এই কাহিনী জানেন।

····ব্যারাকপুরের রাজভবনে গিয়েছেন ডাঃ মুখার্জি! হঠাৎ সকালবেলায় 'ক্যাডিলাক' চড়ে এক তরুণ যুবক এলেন। হাতে একটা প্যাকেট, পরনে দামী স্যুট; বারান্দায় উঠে সশ্রদ্ধভাবে প্রণাম করলেন ডাঃ মুখার্জীকে।·· স্যার, আমি আপনার ছাত্র, মনে পড়ে? অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তাই এলাম আপনাকে আর মাকে প্রণাম করতে। ডাঃ মুখার্জীর স্মৃতিশক্তির সুখ্যাতি থাকলেও তিনি অনেক কষ্টেও ছাত্রটিকে মনে করতে পারলেন না; তবু বল্লেন, তা বেশ কথা, কিন্তু এখন কেমন আছ, কি করছ?

পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত উছলে পড়ল হাসি ছেলেটির মুখে। ·····আজ্ঞে স্যার আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি আর টুকটাক বিজিনেস করছি। গোটাকতক রিভারভ্যালী প্রজেক্টে কনস্ট্রাকশনের ভাল কাজ পেয়েছি, তাছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেণ্টেও কয়েকটা টেণ্ডার দিয়েছি। সবই আপনার আশীর্বাদ।

ছাত্রের (?) আগমনের কারণ জানতে আর সন্দেহ রইল না হরেন্দ্রকুমারের মনে। বিদায় নেবার পূর্বে যুবকটি হাতের প্যাকেটটি ডাঃ মুখার্জীকে দিয়ে জানান, মাকে এই শাড়ীটা দেবেন; আশা করি সন্তানের দান তিনি অগ্রাহ্য করবেন না। প্যাকেটটি খুলে দেখলেন রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জী; বুঝলেন, অতি মূল্যবান শাড়ী। বল্লেন, তা বেশ! তোমার শ্রদ্ধার দান আমার স্ত্রী নিশ্চয়ই নেবেন। তবে কি জান বাবা, এই বাড়ীতে তো আমার

নিজের ফার্ণিচার কিছুই নেই, সবই সরকারী। তাই আমরা রাজভবন ছেড়ে এন্টালীর বাড়ী গেলে তুমি এই শাড়ীটা নিয়ে এস এবং ততদিন পর্যন্ত এটা তোমার কাছে সাবধানে যত্ন করে রেখো। অমাবস্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো কর্নেলটির মুখে; ত্বরিত গতিতে বিদায় নিলো রাজভবন থেকে।

রাজধানী দিল্লীতেও যে এমন কাহিনী ঘটেনা, তা নয়। কয়েক বছর আগেকার কথা। এক ডেপুটি মিনিস্টার তাঁর ছোট্ট মেয়ের জন্মদিনের আনন্দানুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালেন কিছু কিছু বন্ধুবান্ধবকে। ডেপুটি মিনিস্টারসাহেবের হাতে ব্যবসাদারদের ভাল-মন্দ করার বেশ ক্ষমতা ছিল। পার্টি হবে বিকেল পাঁচটায়; কিন্তু গোটা তিনেকের সময় নাকি হঠাৎ এক ব্যবসাদার এম-পি হাজির হয়ে জানালেন, ভাই' হাম সামকো প্লেনমে বোম্বাই যা রাহা, সেজন্য এখন এলাম। হাতে অনেক কাজ, তাই এক্ষুনি চলে যাব। শুনেছি পাঁচ ছ'বছরের ছোট্ট মেয়েটির গলায় ডায়মণ্ড নেকলেসটা পরিয়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ বিদায় নিলেন ভদ্রলোক। ডেপুটি মিনিস্টারসাহেব মেয়েব গলা থেকে নেকলেসটা খুলে নিজের ড্রয়ারে বেখে দিলেন।

কয়েক মাস পরের কথা। এম-পি-সাহেবের পুত্রবধূ (না সদ্য-বিবাহিতা কন্যা) নাকি দিল্লী বেড়াতে এলেন। হঠাৎ এক থালা মিষ্টি নিয়ে ডেপুটি মিনিস্টার এম-পি'র বাড়ী হাজিব! বল্লেন, আপনার পুত্রবধূকে দেখতে এলাম।···

বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা! আপকা মাফিক সজ্জন-বন্ধু মিলনাই মুস্কিল। চা-জলখাবার খেয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠবার আগে ডেপুটি মিনিস্টার-সাহেব বল্লেন, বৌমা শুনে যাও। সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে গলায় পরিয়ে দিলেন ডায়মণ্ডের নেকলেসটা। সদ্যবিবাহিতা তরুণীর অধরে হাসি ফুটিয়ে বিদায় নিলেন ডেপুটি মিনিস্টার সাহেব। কিন্তু এম-পি সাহেবের মুখে কোথাকার যেন জমাট বাঁধা অন্ধকার মুহূর্তের মধ্যে নেমে এলো। আর কেউ না হোক, তিনি তো বুঝলেন, এই ডায়মণ্ডের নেকলেসটা

তিনিই একদিন কিনেছিলেন এই ডেপুটি মিনিস্টারের কন্যার জন্মদিনের উপহারের জন্য।

দুঃখের বিষয় সবাই এই ধরনের নয়। শুনেছি নয়াদিল্লীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত পল্লী ফ্রেণ্ডস্ কলোনীতে এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গোটা তিনেক চমৎকার বাংলো আছে। ফ্রেণ্ডস্ কলোনীব বাড়ী-ভাড়া নিউ ইয়র্কের ফিফথ্ ষ্ট্রীট বা লণ্ডনের কেনসিংটনের বাড়ী-ভাড়ার চাইতেও বেশী। হাজার তিনেকের কম মাসিক দক্ষিণায় দিল্লীর ফ্রেণ্ডস্ কলোনীতে বাড়ী পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং কি প্রাচুর্যের অধিকারী হলে এ হেন স্বর্গ-রাজ্য অলকানন্দায় তিনখানি বাংলোর মালিক হওয়া যায়, তা সবার পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব। মন্ত্রী-মহোদয় কোনদিন ডাক্তারী বা ব্যারিস্টারী করে প্রচুর উপার্জন করে পরে মহাত্মাজীর ডাকে সাড়া দিয়ে দেশসেবায় আত্মাহুতি দিয়েছিলেন বলেও তাঁর জীবন-কাহিনীতে পড়ি নি। তবে মন্ত্রী মহোদয়ের বিবাহের প্রায় চল্লিশ বছর পর শোনা যাচ্ছে তিনি নাকি এক ধন-কুবেরের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং শ্রীমতী ঠাকুরাণীর অলঙ্কার দিয়েই ফ্রেণ্ডস্ কলোনীর তিনটি প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। সাধু-সন্ন্যাসীর দেশ ভারতবর্ষ। যুগে যুগে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় এই পুণ্যময় দেশে এবং তাঁদের অলৌকিক কাহিনীও বহু শোনা যায়। হয়ত এমনি কোন মহাসাধকের অপার করুণায় মন্ত্রীপ্রবরের পত্নীদেবীর অলঙ্কার-রত্নাদির আরো সন্তান-সন্ততি হবে; নযাদিল্লীর মাটি ফুঁড়ে হয়ত গজিয়ে উঠবে আরো কিছু প্রাসাদ।

যতদূর মনে আছে, সংসদে একজন এম-পি প্রশ্ন করেছিলেন, রাজধানী দিল্লীতে কোন কোন মন্ত্রীর নিজস্ব বাড়ী থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বিনা ভাড়ায় সরকারী বাংলো বাড়ী উপভোগ করছেন। প্রশ্নটি এ্যাড্মিট হয়ে যাবার পরে জানা যায়, প্রশ্নটি তুলে নেওয়া হয়েছে। শুনেছি, এই মন্ত্রীপ্রবরের সানুনয়-বিনয়ে প্রশ্নটি উইথড্র করে নেন প্রশ্নকর্তা।

শুধু কি তাই? এই মন্ত্রীর দপ্তরের উদ্যোগে এক কোটি টাকার

এক সরকারী কোম্পানী প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। সরকারী কোম্পানীতে বে-সরকারী অথচ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান করার সরকারী সিদ্ধান্ত চালু হয়েছে বেশ কিছুকাল। শুনেছি মিনিস্টার তাঁর আপন বৈবাহিককে এই এক কোটি টাকার সরকারী কোম্পানীর চেয়ারম্যান করার উদ্যোগ-আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করেছেন। মিনিস্টার-সাহেবের আপন বৈবাহিকের চাইতে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি এক কোটি টাকার সরকারী কোম্পানীর চেয়ারম্যান হতে পারেন বলে অন্ততঃ এই অধমের জানা নেই। আবার শুনেছিলাম, সেক্রেটারীদের কো-অপারেশন পাবার জন্য মিনিষ্টার-সাহেব নিজের মিনিস্ট্রীর এক অত্যন্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীর এক শ্যালক বাবাজীবনকেও ঐ এক কোটি টাকার কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টর করার প্রস্তাব করেছেন। শ্রীমান শ্যালক বাবাজীবন নাকি লাইফ ইন্সিওরেন্সের দালালী করেন; সুতরাং এর চাইতে কোয়ালিফায়েড লোক আর কোথায় পাবেন বলুন?

তেত্রিশ

সাধারণ একজন অফিসারের প্রমোশন বা ট্রান্সফারের খবরের মত অধিকাংশ সংবাদপত্রের একপাশে বেরুল, বি. আর. সেন আরেকবারের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডাইরেক্টার জেনারেল নির্বাচিত হয়েছেন। শতধাবিভক্ত এই পৃথিবীতে তৃতীয় দফায় বি আর. সেনের নির্বাচন-সাফল্যে আমাদের নিশ্চয়ই গর্ববোধ করার কারণ আছে। মাদাম বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ছাড়া বিনয়রঞ্জন সেনই একমাত্র ভারতীয় যিনি বিশ্বসংস্থায় ভারতবর্ষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাছাড়া বাঙালীর কাছে আর একটা কথা স্মরণযোগ্য যে, বিদেশে যত বাঙালী আছেন বিনয়রঞ্জন তাঁদের মধ্যে সবচাইতে সম্মানিত ব্যক্তি।

আই-সি-এস তিলকাঙ্কিত ভাগ্যবানেরা যে মানুষ এবং তাঁদের

দুঃখের অনুভূতিটা যে আমাদেরই মতন, একথা অধিকাংশ দেশপ্রেমিকই মাত্র সেদিন পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন না। এঁদের সঙ্গে ইংল্যণ্ডেশ্বরের একটা অদৃশ্য আত্মীয়তা কল্পনা করতেন অনেকেই। সংবাদপত্রের রিপোর্টারী করতে গিয়ে আই-সি-এসদের সম্পর্কে এমন কোন গোঁড়ামি থাকা সম্ভব নয় এবং আমারও নেই। যে দু'চারজন আই-সি-এস'এর সান্নিধ্যে এসে আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি পেয়েছি, বিনয়রঞ্জন তাঁদের অন্যতম।

মনে পড়ে অগ্নিক্ষরা ১৯৪২! আগস্ট মাসে বোম্বাই কংগ্রেসে গান্ধীজি স্বয়ং 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। আরব সাগরের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কংগ্রেস মণ্ডপ থেকে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উঠেছিল, গৃহীত হলো 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব। শুরু হলো ইংরেজ-বিতাড়ন যজ্ঞ। ঐতিহাসিক আগস্ট আন্দোলনে বাংলা দেশের মেদিনীপুরে স্বদেশীরাজ্যই গড়ে উঠল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এন. এম. খান নিজের বাংলোয় শুধু পায়চারি করে কাটিয়েছিলেন রাতের পর রাত। তন্দ্রাচ্ছন্ন শেষরাত্রে তেরাঙ্গা আর 'বন্দেমাতরম্'-এর দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়মড় করে উঠতেন। 'শয়তানদের' সায়েস্তা করার নেশায় মশগুল হয়ে উঠেছিলেন খানসাহেব।

অক্টোবরে হলো এক মহা সাইক্লোন। সারা মেদিনীপুরই প্রায় এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। মাঠের ধান, ঘরের চাল উড়ে গেল। পড়ে রইল অসংখ্য নারী-পুরুষ গরু-ছাগলের মৃতদেহ। প্রকৃতির খেয়ালে মেদিনীপুরবাসীর এই নির্মম নিগ্রহে চারদিকে উঠেছিল কান্নার রোল। রোমসম্রাট নীরোর মত খানসাহেব দেশবাসীর এমনি দুঃখের দিনে বাঁশি বাজিয়েছিলেন। তিনদিন বাদে বাংলা সরকারের হেড কোয়াটার্সে সাইক্লোনের প্রথম খবর পাঠিয়ে ছিলেন খাঁসাহেব। খবরের শেষে ছোট্ট একটা মন্তব্য জুড়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব। লিখেছিলেন, মেদিনীপুরবাসীকে সায়েস্তা করার এই মহত্তম সুযোগ। সুতরাং সাইক্লোন-বিধ্বস্ত রাষ্ট্রদ্রোহী মেদিনীপুরবাসীদের কোন সাহায্য না দেওয়াই সমীচীন হবে।

লীগ মন্ত্রিসভার সদস্যদের আলাপের ঘরের দুলাল ছিলেন এন. এম. খান। তাই একথা লেখার দুঃসাহস তাঁর হয়েছিল।

বি. আর. সেন তখন বাংলা সরকারের রাজস্ব দপ্তরের সেক্রেটারী; সাহায্য দপ্তরও তাঁরই অধীনে ছিল! তিনদিন বাদে সাইক্লোনের খবর পেয়ে ক্ষেপে গিয়েছিলেন; খবরের শেষে খানসাহেবের মন্তব্য দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন মিঃ সেন। খাঁসাহেবের যথেচ্ছাচারে ও ঔদাসীন্যে অনেকেরই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গেছিল, মিঃ সেনও অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। বাঙালী হয়ে বাঙালীর প্রতি এমন নির্মম ঔদাসীন্য তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি। 'বাজার' বাজিয়ে পার্সোনাল এসিস্টান্ট অমর মুখার্জিকে ডাক দিয়েছিলেন। বলেছিলেন নোট ডাউন।......Crown can not differenciate between one citizen and the other, specially in their distress......কমন্স'এর ডিবেট 'কাট' করেছিলেন, রেফারেন্স দিয়েছিলেন কুইন্স ডিক্লারেশানের। তারপর ফাইলের স্তূপ নিয়ে লীগ মন্ত্রীপুরুষদের দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি তুলে ধরেননি মিঃ সেন; সরাসরি লাটসাহেবের বাড়ী হাজির হয়েছিলেন। লাটসাহেবকে দিয়ে মেদিনীপুরে সাহায্য পাঠাবার আদেশ লিখিয়েই রাইটার্স বিল্ডিংসে ফিরেছিলেন।

স্যার জন হার্বার্ট তখন বাংলার লাটসাহেব। দেহটা লম্বা-চওড়ায় বিরাট হলেও হৃৎপিণ্ডটা বোধকরি ততবড় ছিল না! তাই বি. আর. সেনের প্রতি তিনিও বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। মিঃ সেনও সেকথা জানতেন এবং তাই তিনি দিল্লীর মসনদে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে কলকাতা ত্যাগ করেন।

দেশটা দু'টুকরো হবার পর এন, এম, খানের অদৃষ্টের সিংহদ্বার খুলেছিল। অতীত জীবনে সৃষ্ট কঙ্কালস্তূপের উপর বসে খাঁসাহেব পূর্ব বাংলার চীফ সেক্রেটারী হয়েছিলেন। পূর্ব বাংলাকে রসাতলে দেবার জন্য ষোড়শোপচারে যাগ-যজ্ঞ করেছিলেন! ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে গদাচ্যুত করে ইস্কান্দার মীর্জাকে ঢাকার মসনদে একচ্ছত্র অধিপতি

করবার জন্য খাঁসাহেবের যথেষ্ট সুনাম আছে। কবর ফুঁড়ে জিন্নাই বোধহয় খাঁসাহেবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। অথবা খাঁসাহেবের প্রতি সুবিচার করবার জন্য করাচীর কর্তাদের স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন। নচেৎ, প্ল্যানচেটে কয়েদী আজমকে টেনে খাঁসাহেবের নিজের দরখাস্তের উপর strongly recommended লিখিয়ে নিয়েছিলেন। মিথ্যা বলব না, দয়ার্দ্রচিত্ত করাচীব মহাপ্রভুরাও খাঁসাহেবের প্রতি অবিচার করেননি, ববং একটু অতিরিক্ত সুবিচার করেছিলেন।

বর্তমান নিয়ে আমরা এতটা মশগুল যে সাম্প্রতিককালের এসব ইতিহাসও আমরা ভুলতে বসেছি। বিদ্যাসাগরেব স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সাধুবাদ জানিয়েছিলেন বিনয়রঞ্জন সেনকে। তাই নয় কি?

নেহরুও পাকা জহুবী। বুঝেছিলেন বিনয়রঞ্জন সেন একটি রক্তমুখী নীলা। তাই দেশে-বিদেশে তাকে সম্মান দিতে তিনি কার্পণ্য করেননি।

সেনসাহেবেব বাহ্যিক আচরণে যতটা সাহেবীয়ানা ও আভিজাত্য দেখান, ভিতবে ভিতরে ঠিক ততটাই তিনি বাঙালী, ভারতীয় ও সহজ-সরল।·· অতীত রোমের সাক্ষী কলিশিয়ামেব পাশ দিয়ে ঘুরে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে মোড ঘুরতেই পেলাম মিঃ সেনের প্রধান কর্মস্থল···আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হেড কোয়ার্টার্স। বন্ধুবব ডাঃ মণি মৌলিক আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্য; সোজা নিয়ে গেলেন মিঃ সেনের ঘরে। আনন্দের আতিশয্যে মিঃ সেন জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। কথায়-কথায় অনেক কথা বললেন মিঃ সেন। বললেন, জীবনে বহু দেশ ঘুবলাম, বহু কিছু দেখলাম, প্রাচুর্য্যেব বন্যা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি জীবনে। কিন্তু ভুলতে পাবিনি বাংলাদেশের দারিদ্র্যক্লিষ্ট গ্রামের মানুষকে। বহুদিন হলো পল্লী-বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ নেই; তবু অতীত জীবনে কঙ্কালসার মানুষের কথা ভেবে মনে হয়েছে পৃথিবীতে না জানি কত কোটি মানুষ বুভুক্ষু থাকে। তাইতো পৃথিবীর কোটি-কোটি নিরন্ন মানুষের সেবাব ভার নিয়ে আমি ধন্য।

অদৃষ্টের পরিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে বাঙালী মনীষা ও কর্মনিষ্ঠা সারা দেশকে অভিভূত করেছিল, সেই বাঙালীই আজ জীবনের নানাক্ষেত্রে ব্যর্থতার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিনয়রঞ্জম সেনের প্রতিষ্ঠায় আমাদের আনন্দ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। যে বাঙালী আজ দিল্লীর-দরবারে পর্যন্ত অনাদৃত সেই বাঙালীদের একজন বিশ্ব-নেতৃবৃন্দের দ্বারা অভিনন্দিত হচ্ছেন, এটা কি কম গৌববের !

চৌত্রিশ

দেশ নয়ত যেন একটি হাখফেন। ভূমধ্য সাগরের পূর্ব দিগন্তের এই ছোট্ট দ্বীপ সাইপ্রাস মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম ইউরোপের মাঝে বহুদিন বহুযুগ ধবে এ ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ। ইতিহাসেব বহু অধ্যায়ে সাইপ্রাসেব উল্লেখ। খ্রীষ্টপূর্ব চোদ্দশ পঞ্চাশে এলো মিশরীয় প্রভুত্ব। এসেছে অ্যাসিরিয়ান, পারস্য, বাইজ্যানটাইন, রোম, গ্রীক, তুর্কী আধিপত্য। তিনশ' বছব তুর্কী রাজত্ব চলাব পর ১৭৭৮'এ সদ্যনির্মিত সুয়েজ খাল রক্ষার অছিলায় তদানীন্তন তুর্কী সুলতানের প্রতিনিধি হয়ে ইংরেজ সাইপ্রাস শাসন আরম্ভ করল। সুলতানেব প্রতিনিধি হয়ে এই ক্ষুদ্র ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপে ইংরেজ নিজেব সরকার গড়ে তুলল, নিয়ে এলো তার সৈন্যবাহিনী আর সর্বোপবি ইংলণ্ডেশ্বরের ঝাণ্ডা। ঠিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীব ঢঙে ইংরেজ তার সাম্রাজ্যবাদী অক্টোপাশে বেঁধে ফেলল সাই প্রাসকে। তারপর বহুদিন পর এলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৪'এ ইংবেজের সঙ্গে তুরস্কের যুদ্ধ বাধতে না বাধতেই ইংরেজ রাতারাতি অধিকার করে নিল সাইপ্রাস। সাইপ্রাস স্বাধীন হলো এই ত সেদিন, উনিশ'শ ষাটের ষোলই অক্টোবর। সৌম্যদর্শন আর্কবিশপ ম্যাকারিয়স হলেন স্বাধীন সাইপ্রাসের প্রথম প্রেসিডেন্ট।

এতো হলো ইতিহাস। কিন্তু বহু জনের হয়ত জানা নেই ভারতবাসীকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করে সাইপ্রাসের প্রতিটি মানুষ।

তাই তো ভূমধ্য মহাসাগরের এই ক্ষুদ্র দ্বীপে রক্তক্ষয়ী জ্ঞাতি-লড়াই'এ আমাদের দুঃখিত হবার কারণ আছে। কিন্তু দুঃখের কথা সব সময় আমরা শত্রু-মিত্র বিচার করতে পারি না। উঠতে বসতে যে দেশ তবলার মত ভারতবর্ষকে চাঁটি মেরে চলেছে, সে-সব দেশের জন্য অশ্রুবিসর্জনে আমাদের কার্পণ্য নেই; অথচ সাইপ্রাসের ঘটনা নিয়ে একটি শব্দ বেরুল না। ভবিষ্যতেও বেরুবে কিনা সন্দেহ। সাইপ্রাসের স্বাধীনতার জন্য নেহরুর আবেদনের কথা সে-দেশের পৌনে ছ' লক্ষ নারীপুরুষ যে আজীবন মনে রাখবেন এ খবর রাজধানীর কোন সাহেব জানেন কিনা সন্দেহ।

সাইপ্রাস আকারে বড় না হলেও গুরুত্বে প্রধান। আকারে সাইপ্রাস মোটামুটি আমাদের মেদিনীপুর জেলার চাইতে সামান্য বড়। লোকসংখ্যা পৌনে ছ'লক্ষের কিছু বেশী; অর্থাৎ জলপাই-গুড়ির সদর মহকুমার জনসংখ্যার প্রায় সমান। এদিক দিয়ে সাই-প্রাসের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে এই ক্ষুদ্র দ্বীপের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। তুরস্কের মাত্র চল্লিশ মাইল দক্ষিণে, সিরিয়ার ষাট মাইল পূর্বে, নাসেরের ইউ-নাইটেড আরব রিপাবলিকের দু'শো চল্লিশ মাইল উত্তরে হচ্ছে সাইপ্রাস। ইউরোপের অন্তিমপ্রান্তও এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি থেকে বেশী দূরে নয়। তাই তো স্বাধীনতা দেবার পরও ভূমধ্যসাগরীয় ইংরেজ নৌবাহিনীর প্রধান কেন্দ্রস্থল আজও সাইপ্রাসেই রয়ে গেছে।

……দিল্লী থেকে চলেছি বেলগ্রেড। 'নিউট্রাল সামিট' কভার করতে। সন্ধ্যার বেশ কিছু পর পালামের মাটি থেকে উড়ে মাঝ-রাতের আগেই এলাম পার্সিয়ান গালফ-এর তীরে 'বাহরেন'এ। তারপর শেষরাতে বেইরুট, প্যারিস অফ দি মিডল-ইষ্ট। একদিন পর রওয়ানা হলাম এথেন্স। বৃটিশ ইউরোপিয়ান এয়ারওয়েজের প্লেনটি মাঝপথে থামবে নিকোশিয়া—সাইপ্রাসের রাজধানী। লেবাননের একমাত্র ইংরেজি কাগজের হেড লাইন দেখা শেষ করতেই না নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি ভূমধ্য মহাসাগরের

অনন্তবিস্তৃত নীলজল। লেবানীজ বিউটি বি-ই-এ'এর একজন এয়ার হোষ্টেস কফি দিলেন। কফির কাপে চুমুক দিতেই মনটা ডুব মারল। মনে পড়ল, রোমান আর গ্রীক মাইথলজীর গল্প। গ্রীকদের প্রেমের দেবতা 'অ্যাফ্রোডাইট', রোমানদের ভেনাস'এর আদি ভূমি হচ্ছে সাইপ্রাস। এই দ্বীপেই রয়েছে সেই প্রেমের দেবতার মন্দির যেখানে যুগ যুগ ধরে না জানি কত অসংখ্য মেয়ে এসেছে তাদের যৌবনে সাধনার নৈবেদ্য দিতে। প্রবাদ আছে, অতীতে অ্যাফ্রোডাইটের মন্দিরে পূজা দেবার পূর্বে মেয়েরা তাদের কৌমার্য দান করত কোন না কোন পুরুষকে। নিঃসন্তান নারী আজও সন্তান কামনায় এই প্রেমের দেবতার দ্বারে হাজির হন হাজারে হাজারে।

অতীতের কাহিনী রোমন্থন করতে করতে আবার দৃষ্টি পড়ল নীচের দিকে। দূরে লাল মাটি নজর পড়ল, বুঝলাম সাইপ্রাস এসে গেছি। দূর থেকেই নিকোশিয়া এয়ারপোর্টে অনেক লোকজন দেখতে পেলাম। প্লেন থামবার পর নীচে এসে জানলাম, প্রেসিডেন্ট আর্কবিশপ মাকারিয়স্ আমাদের প্লেনেই বেলগ্রেডের পথে এথেন্স যাবেন। 'টার্মিনস বিল্ডিং' এ চা খেতে খেতে দেখলাম আমাদের প্লেনের উপর প্ল্যাষ্টিক বোর্ড দিয়ে বৃটিশ ইউরোপিয়ান এয়ারওয়েজ লেখাটি ঢেকে দেওয়া হলো ; নতুন প্ল্যাষ্টিক বোর্ডে লেখা, সাইপ্রাস এয়ারওয়েজ। সাইপ্রাসের ফ্ল্যাগ ও প্রেসিডেন্টস স্ট্যাণ্ডার্ড উড়ল প্লেনের ছ'দিকে।

প্লেনের সামনের দরজা দিয়ে সদলবলে প্রেসিডেন্ট প্লেনে চড়লেন ; চলে গেলেন নিজের ক্যাবিনে।

প্লেন টেক অফ্ করার কয়েক মিনিট পর এয়ার হোস্টেসের হাতে আমার একটা কার্ড দিয়ে বললাম, প্লিজ পাস্ অন টু প্রেসিডেন্টস্ প্রাইভেট সেক্রেটারী।

হোস্টেস একটু বিব্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন অন্যায় হবে না তো ?

'বিন্দুমাত্র না।'

ছ'এক মিনিট বাদে স্বয়ং ক্যাপ্টেন এসে প্রশ্ন করলেন, এক্সকিউজ

মী স্যার, আই হোপ দেয়ার ইজ নাথিং রং ইন প্যাসিং অন ইওর কার্ড টু হিস্ এক্সেলেনসীস্ প্রাইভেট সেক্রেটারী।

আর একবার জানালাম, আই সাপোজ নট।

ধন্যবাদ জানিয়ে ক্যাপ্টেন বিদায় নেবার কয়েক মিনিট বাদেই ক্যাবিন্ থেকে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। আমার কার্ডটি তাঁর হাতে দেখে আমি উঠে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিত দিলাম, কার্ডটি আমারই। ভদ্রলোক কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আই অ্যাম স্পাইরস কিপ্রিয়ানউ, ফরেন মিনিস্টার অফ সাইপ্রাস। প্রেসিডেণ্ট একটা চিঠি ডিক্‌টেশন দিচ্ছেন, শেষ হলেই আপনাকে ডেকে পাঠাবেন।

আমি অশেষ ধন্যবাদ জানালাম। 'মেনি মেনি থ্যাঙ্কস মিঃ ফরেন মিনিস্টার'।

পাঁচ-সাত মিনিট বাদেই তলব পড়ল প্রেসিডেণ্টের ক্যাবিনে। প্রেসিডেণ্টের হাত ধরে আনত শিরে আমি শ্রদ্ধা জানালাম ভূমধ্য মহাসাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপে অতিখ্যাত বিপ্লবী আর্কবিশপ ম্যাকারিয়াসকে।

সৌম্যদর্শন সেই খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক বিপ্লবীকে বললাম ইওর একসেলেনসী ইট ইজ এ্যান ইউনিক অনার টু বী রিসিভড্ বাই ইউ অন বোর্ড অ্যান এয়ারক্র্যাফট্।

প্রেসিডেণ্ট বললেন, নট এ্যাট অল মাই বয়! ইট ইজ মাই প্লেজার টু মীট এ ইয়ং ইণ্ডিয়ান ফ্রেণ্ড।

বহুবার অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে প্রেসিডেণ্ট ম্যাকারিয়াস জোর করে আমাকে তাঁর সীটে বসিয়ে দিলেন; নিজে বসলেন হাতলের উপর। বেলগ্রেড সাম্মিট কভার করতে চলেছি জেনে আনন্দ প্রকাশ করলেন প্রেসিডেণ্ট।

ঘণ্টা দুই কি তারও বেশী কিছু সময় ধরে প্রেসিডেণ্ট ম্যাকারিয়াস অনেক কথা বললেন আমাকে।……তোমরা হয়ত জান না, সাইপ্রাসের মানুষ ভারতবর্ষের প্রতি কতটা কৃতজ্ঞ। আমাদের স্বাধীনতার পিছনে তোমার দেশের অবিস্মরণীয় অবদান আছে।

প্রাইম মিনিস্টার নেহরুর সাহায্য, সহযোগিতা ও সদিচ্ছা সাইপ্রাসের মানুষের কাছে একটা ইতিহাস বিশেষ। শুধু কি তাই? ইউনাইটেড নেশনস'এ তোমাদের মেননের বক্তৃতা? বৃটিশ পলিসি টুয়ার্ডস সাইপ্রাস ওয়াজ নেভার বিফোর সো এক্সেলেণ্টলি এক্সপোজড্ এ্যাজ ইট ওয়াজ বাই মেনন ইন ইউনাইটেড্ নেশনস।

আমাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ম্যাকারিয়াস বললেন, আমরা এসব কিছুই ভুলিনি। সাইপ্রাসের কুলি-খালাসীরা পর্যন্ত এসব জানে। সাইপ্রাস সম্পর্কে নেহরুর কমেণ্টস্ আমাদের দেশের কাগজে হেড লাইন হয়েছে, বিপ্লবী কর্মীরা তা হ্যাণ্ডবিল করে ছেপে বিলি করেছে সারা দেশে।

প্রেসিডেণ্ট একবার আক্ষেপ করে বললেন, দুঃখের কথা কি জান, তোমাদের দেশের কোন ডিপ্লোম্যাটিক মিশন নেই আমাদের দেশে। আমি বলি, ভেরি আনফরচুনেট।

তা তো বটেই, তবে শীগ্‌গির হবে বলে আমি আশা করি, ম্যাকারিয়াস বললেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে প্লেন এথেন্স ল্যাণ্ড করবে শুনে আমি প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে বিদায় নিলাম; মুগ্ধ মনে ফিরে এলাম নিজের সীটে।

এথেন্সে প্লেন থেকে সব চাইতে আগে নামলেন প্রেসিডেণ্ট ম্যাকারিয়াস; তারপর তাঁর পার্টির সদস্যরা। এথেন্সে যে আমার জন্য একটা দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছিল, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। একজন বিমানকর্মীর কাছে খোঁজ করে জানলাম, যুগোশ্লাভ এয়ার ট্রান্সপোর্টের যে প্লেনে আমার যাবার স্থির, তা টাইম টেবিল পরিবর্তনের জন্য আধ ঘণ্টা আগেই চলে গেছে। নেক্সট্ ফ্লাইট তার পরের দিন। আমাকে সেইদিন বেলগ্রেড পৌঁছতে হবে, পরের দিন সকালেই নিউট্রাল সামিট আরম্ভ হবে।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট ম্যাকারিয়াসকে বহুজনে অভ্যর্থনা করে ভি-আই-পি লাউঞ্জে নিয়ে গেছে। আমি অন্যান্য প্যাসেঞ্জারদের

সঙ্গে ধীর পদক্ষেপে টার্মিনাল বিল্ডিংএর দিকে চলেছি। হঠাৎ কানে ভেসে এলো, ইন্দি জার্নালিষ্ট! ইন্দি জার্নালিষ্ট! পিছন ফিরে দেখি একজন পুলিশ অফিসার দৌড়তে দৌড়তে আসছেন। আমার কাছে এসে বললেন, ইন্দি জার্নালিষ্ট ?

মাথা নেড়ে জানালাম, আমিই ইণ্ডিয়ান জার্নালিষ্ট।

প্রেসিডেন্ট ম্যাকারিয়াস আমার খোঁজ করছেন শুনে আমি গ্রীক পুলিশ অফিসারটির সঙ্গে ভি-আই-পি লাউঞ্জে গেলাম। আমাকে প্রেসিডেন্ট বললেন, ভিড়ের মধ্যে আর তোমাকে দেখতে পেলাম না, তাই খোঁজ করছিলাম।······তা তোমার প্লেন কখন ?

আমাকে স্মরণ করার জন্য প্রেসিডেন্টকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার দুঃসংবাদ জানালাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট খোঁজ করে জানলেন, তাঁর বেলগ্রেড যাবার জন্য প্রেসিডেন্ট টিটো একটা স্পেশ্যাল প্লেন পাঠিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট ম্যাকারিয়াসের অনুগ্রহে আমিও ঐ স্পেশ্যাল প্লেনে চললাম। বেলগ্রেডে পৌঁছে স্পেশ্যাল প্লেন প্রথমে ল্যাণ্ড করল মিলিটারি এয়ারপোর্টে। প্লেনের মধ্যে বসে আমি প্রেসিডেন্ট টিটোর অভ্যর্থনা দেখলাম। দেখলাম সব অনুষ্ঠান শেষে দুই প্রেসিডেন্ট এক গাড়ি চড়ে এয়ারপোর্ট থেকে বিদায় নিলেন। এক মাত্র আমি যাত্রী রইলাম। প্লেন আবার টেক্ অফ্ক··কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেলগ্রেডের সিভিলিয়ান এয়ারপোর্টে হাজির হলো। শুধু আমাকে নিয়ে প্লেনটা কেন এই এযারপোর্টে এলো তাঁর খোঁজ করলাম ক্যাপ্টেনের কাছে। তিনি জানালেন, আমার ডিপ্লোম্যাটিক পাশপোর্ট নেই বলে ঐ এয়ারপোর্টে নামতে পারিনি।

ভারতবর্ষ থেকে বহু দূরের ভূমধ্য সাগরের ঐ দ্বীপের প্রথম নাগরিককে মনে মনে বার বার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি যুগোশ্লাভিয়ার মাটি স্পর্শ করলাম। খবরের কাগজে সাইপ্রাসের রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃ-বিদ্বেষের খবরে তাই আমি মনে ব্যথা পাচ্ছি। আমি নিরুপায়।

পঁয়ত্রিশ

মাই ডিয়ার মিস্ চ্যাটার্জী,

অসংখ্য ধন্যবাদ। কলিকাতা ফিরেই যে আপনি এমনভাবে চিঠি লিখে আমাকে স্মরণ করবেন, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। মুখে প্রকাশ করতে পারিনি যে আমি আপনার রূপ, যৌবন ও সর্বোপরি ব্যবসায়িক বুদ্ধি দেখে আগেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, এহ বাহ্য। আপনার চিঠি পড়ে মনে হলো, আপনি যদি সেলস প্রমোশন অফিসার না হয়ে সাহিত্যিক হতেন, তাহলে অনেক সাহিত্যিক বহুদিন আগে কলেজ ষ্ট্রীট পাড়ায় যাতাযাত বন্ধ করতে বাধ্য হতেন। শরৎ চাটুজ্জ্যে কলমের জোরে মানুষের মন ভিজিয়েছেন। আপনার মিষ্টি হাতের ঐ সুন্দর চিঠিটা পড়ে মনে হলো, সার্থক সাহিত্যিক ছাড়া যদি অন্য কেউ কলমের জোরে মানুষের মন ভেজাতে পারেন তবে সে আমাদের মিস চ্যাটার্জীর মত সর্বজনধন্য সেলস্ প্রমোশন অফিসার।

আপনাকে এবার দেখে ও পরে চিঠি পেয়ে ক'বছরের অতীত কাহিনী আজ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। বিশ্বাস করুন মিস চ্যাটার্জী, আজ নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে! মনে পড়ে বছর তিনেক আগের ভোরবেলায় দমদম এয়ারপোর্টের কাহিনী?

......কদিন ধরে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ছিলাম। তারপর ডিসেম্বরের শেষে দিল্লীর শীতকে অগ্রাহ্য করে ভোর পাঁচটায় পালামে গিয়ে স্পেশ্যাল প্লেন ধরবার জন্য মেজাজটা আরো খারাপ ছিল। কিন্তু মিনিস্টার আমারই সংশ্লিষ্ট এক অনুষ্ঠানের জন্য কলকাতা যাচ্ছিলেন বলে বাধ্য হয়েই আমাকে তাঁর সঙ্গী হতে হয়েছিল। সকালবেলায় দমদমের একটু একটু ঠাণ্ডা হাওয়া মিষ্টি রোদ বেশ লেগেছিল। আরো ভাল লেগেছিল একদল নিরেট গচ্ছের মত অফিসারদের ভিড়ের মধ্যে আপনাকে দেখে। লাইট স্কাই কলারের ফ্রেঞ্চ শিফন শাড়ী পরেছিলেন আপনি। তাই না? আধেক আবৃত উর্ধ্বাঙ্গে ছিল লাইট ক্রিম কলারের ওয়ান-পিস ব্লাউজ, অধরে

ন্যাচারাল কলারের একটু ছোঁয়া আর কপালে অরেঞ্জ টিপ। একেই তো আপনার চোখ দুটো অমন চমৎকার এবং তার উপর ঘন কালো টানা ভ্রূ। একটান সুরমা লাগিয়ে আসবার কোন দরকার ছিল না, কিন্তু তবু বলব, ভালই করেছিলেন।

জানেন মিস চ্যাটার্জী, আপনাকে দেখে প্রথমে কি ভেবেছিলাম? ভেবেছিলাম ছাত্রী-জীবনে আপনি নিশ্চয়ই হেলেন অফ ট্রয়-ক্লিও-পেট্রার মত অসংখ্য ছাত্রের জীবনে মহাবিপর্যয় ঘটিয়ে এক অপদার্থ অথচ ভাগ্যবান অফিসারের জীবনসঙ্গিনী হয়েছেন। কথাটা ভেবেই সারা মনটা রি রি করে উঠেছিল। প্লেন থেকে নামার পর মিনিস্টারের হাতে আপনি যখন পেকডিয়ান লিলিব তোড়াটা দিয়ে নিজেকে মিস চ্যাটার্জী বলে পরিচয় দিলেন, তখন যে কী প্রশান্তি মনে মনে উপভোগ করেছিলাম সেকথা হয়ত আপনাকে ঠিকভাবে বোঝাবার কোন অবসর আমার জীবনে আসবে না।

কিন্তু কি অদৃষ্ট বলুন তো? বিধাতাপুরুষের নিদারুণ রসিকতার ভিক্‌টিম হয়েছিলাম দুজনেই। সবার সামনে আপনাকে আমার অনেক অপ্রিয় কথা বলতে হয়েছিল। আপনি অবশ্য আমাকে ইংরেজী ভাষায় চাবুক মারতে কার্পণ্য করেননি সেদিন সকালে। বিশ্বাস করুন আমি নিরুপায় হয়েই সেদিন মিনিস্টারকে আপনাদের ফ্যাক্টরীতে যেতে দিইনি। সাধারণতঃ কোন বিশেষ স্বার্থের জন্যই ব্যবসায়ীরা মিনিস্টারদের তাদের কল-কারখানা দেখাতে নিয়ে যান। মিনিস্টাররা কল-কারখানায় যান, কিন্তু তার জন্য আগে থেকে নিমন্ত্রণ করে ব্যবস্থা করা দরকার। বাংলাদেশের অত বড় একজন বিখ্যাত শিল্পপতি হয়েও আপনার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের এই সামান্য সৌজন্য-জ্ঞানের অভাবে আমার ভীষণ রাগ হয়েছিল। তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন আপনার মত সুন্দরী সেলস্ প্রমোশন অফিসার পাঠালে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে মিনিস্টারকে ধরে আনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না। আমার কাছে সমস্ত জিনিসটা 'সিলি' লেগেছিল এবং সেজন্য মিনিস্টারকে আমি যেতে দিইনি।

সেদিন হয়ত আমি ঠিকই করেছিলাম। কিন্তু আপনার সঙ্গে প্রথম দর্শনের দিন কথা কাটাকাটি হওয়ায় আজ ভীষণ দুঃখ হচ্ছে।

এরপর আপনার সঙ্গে দেখা হয় নাগপুর এয়ারপোর্টে। নাইট এয়ারমেল সার্ভিসে আমি যাচ্ছিলাম কলকাতা আর আপনি চলেছিলেন কলকাতা থেকে বোম্বে। মধ্যরাত্রিতে সারা দেশের বিমানযাত্রীদের মিলন-মন্দির নাগপুর এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্টে আপনি আর আমি মুখোমুখী বসে কফি আর ভেজিটেবল চপ খেয়েছিলাম আই-এ-সি'র পয়সায়। কিন্তু তখনও আপনার রাগ কমেনি; শুধু শুভেচ্ছা বিনিময় হয়েছিল। মনে পড়ে মিস চ্যাটার্জী?

কামরাজ প্ল্যান বা ডেমোক্র্যাসী এ্যাণ্ড সোস্থালিজম প্রস্তাবের জন্য নয়, জয়পুর কংগ্রেস আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে রইবে বাংলার বিখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সেলস্ প্রমোশন অফিসার মিস সুমিত্রা চ্যাটার্জীর জন্য। ফর গডস্ সেক বিলিভ মি, একটুও বাড়িয়ে বুদ্ধি বলছি না, জয়পুরে আপনার স্মার্টনেস, আপনার ব্যবসায়িক ও নৈপুণ্য দেখে বাঙলী মেয়েদের সম্পর্কে আমার জ্ঞান গভীরতর হলো।

এক্সকিউজ মি, আপনার কোম্পানীর কর্তা কেমন যেন বোকা-বোকা। নিতান্ত পরিচয় না থাকলে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না বাংলাদেশের এতবড় একজন শিল্পপতি এমন হতে পারেন। কর্তা আপনাকে কত মাইনে দেন, জানি না; তবে তিনি আপনার জন্য চৌরঙ্গীর ফ্লাট, গাড়ী, ফ্রি ট্রাভেল ও আনুষঙ্গিক খরচ করে যে অন্যায় করেনা, তা আমি মনে প্রাণে বুঝেছি জয়পুরে। বাঙালী ব্যবসাদারের পক্ষে ফরেন কোলাবোরেশনের ব্যবসা করে বাংলার বাইরে কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তা আমি একটু আধটু বুঝি। কিন্তু ঐ স্টেটের অতগুলো মিনিস্টারের সঙ্গে আপনার যা ঘনিষ্ঠতা দেখলাম তাতে মনে হলো সুমিত্রা চ্যাটার্জীর মত সেলস্ প্রমোশন অফিসার থাকলে যে-কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সারা দেশে ফ্যাক্টরী গড়ে তোলা সম্ভব। জনৈক ওপরওয়ালাকে যেভাবে আপনার

সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখলাম, তাতে বিস্মিত না হয়ে পারিনি। একজন বাঙালী মেয়েকে সুদূর আর এক প্রদেশের মিনিস্টারদের সঙ্গে এমনভাবে দহরম-মহরম করতে আর দেখেছি বলে মনে হয় না। স্বয়ং চীফ মিনিস্টারই তো কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে ঢোকার পথে আপনার গালে টোকা মেরে গেলেন। তাই না? আপনি হয়ত আমাকে খেয়াল করেন নি, কিন্তু আমি সব দেখেছি।

মিস চ্যাটার্জী, আপনার প্রশংসা করে যেন মন ভরাতে পারি না। এই যে এতবড় ফরাসী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপনাদের কোম্পানীর কোলাবোরেশন পাকাপাকি হলো তা কি শুধু আপনার জন্যই নয়? আপনার কোম্পানীর কর্তা পারত ঐ দুই ফরাসী ছোঁড়াকে সামলাতে? সার্টেনলি নট। রামব্যাগ প্যালেস হোটেলে জায়গা না পেয়ে দুজন ফরাসী অতিথিকে নিয়ে কর্তা পারত জয়পুরের ঐ অখ্যাত হোটেলে ঢুকতে? হলপ করে বলতে পারি এই দুঃসাহস বাঙালীর মেয়ে মিস সুমিত্রা চ্যাটার্জী ছাড়া আর কারোর হতো না।

প্রথম দিন এ-আই-সি-সি'র পর বেশ রাত্রে খেতে গিয়েছিলাম মীর্জা ইসমাইল রোডের ঐ রেস্টুরেণ্টটায়। আবিষ্কার করলাম এক গেলাস ড্রিঙ্ক নিয়ে বসে আছেন আপনাদের মনিব এক কোণে। উনি দেখেননি, আমিই এগিয়ে গেলাম। টেনে নিয়ে বসালেন পাশে। অর্ডার দিলেন ডিনারের। খেতে খেতে অনেক কথা বললেন উনি। কিন্তু সে-সবই আপনাকে কেন্দ্র করে। বললেন আট বছর আগে আপনাকে উনি আবিষ্কার করেছিলেন; দিয়েছিলেন অফিসে এক সাধারণ চাকরি। কিন্তু আপনার কর্মনৈপুণ্যের পরিচয় পেতে ওঁর দেরী হয়নি। দু'বছর পর নাকি আপনি মাত্র কুড়ি বছর বয়সে এই বিখ্যাত শিল্পপতির প্রাইভেট সেক্রেটারী হন। চিকেন রোস্ট পাশে সরিয়ে রেখে কর্তা বললেন, 'কয়েক মাসের মধ্যেই বুঝলাম সুমিত্রাকে ছাড়া আমার এক পা চলাও অসম্ভব। দু' দু'বার ফরেন কোলাবোরেশনের জন্য জার্মানী ও আমেরিকা গিয়ে যে সাক্‌সেস্‌ফুল হয়েছি তা ঐ মেয়েটার বুদ্ধির জন্যই।' এক টুকরো মাংস মুখে দিলেন

উনি। আবার বললেন, 'জানেন মশাই, সুমির বয়স আজ পঁচিশ ছাবিশ হলে কি হবে, মনটা এখনও ভীষণ কাঁচা। এখনও ওর পাশে না বসলে ওর ঘুম আসে না। রোজ অফিস থেকে ফ্যাক্টরী হয়ে সন্ধ্যার পর যাই সুমির ফ্লাটে। বিজিনেসের কাজকর্ম সেরে খাওয়া-দাওয়া করে ওকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আমার ছুটি।'

আমি কি বললাম, জানেন মিস চ্যাটার্জী? গভীর ভালবাসার সম্পর্ক না হলে কখনও মিস চ্যাটার্জী আপনার কোম্পানীর জন্য এত করতেন না।

এবার গর্বের সঙ্গে কর্তা বললেন, 'সুমি ইজ এ ফাস্ট ক্লাস ডান্সার টু ...এই ত মিঃ গানার বলছিলেন, কাল রাত্রে সুমি এমন চমৎকার ফিক্সট্ পয়েন্ট ডান্স দেখিয়েছেন যা প্যারিসেও সব সময় পাওয়া যায় না।'

আচ্ছা মিস চ্যাটার্জী, আমাদের নির্গুণ করে ভগবান আপনাকে সব গুণ এমন উজাড় করে কেন দিলেন বলুন তো? আরো কিছু বাঙালী মেয়েকে ভগবান কেন আপনার মত করলেন না বলুন তো? কয়েক ডজন সুমিত্রা চ্যাটার্জী থাকলে বাংলাদেশে কত কলকারখানা হতো, কত বেকার বাঙালী ছেলে-মেয়ে চাকরি পেতো বলুন তো? ডক্টর সঞ্জয়ের মত তুষ্ট অর্ফিসারকে হাত করে বাংলাদেশের জন্য আরো কিছু কনট্রাক্ট, কিছু পারমিট কিছু লাইসেন্স, কিছু টেণ্ডার যোগাড় করতে পারে, এমন সুমিত্রা চ্যাটার্জী কি দুটো নেই বাংলাদেশে? মনে হয়, নেই। আপনি একমেবাদ্বিতীয়ম।

বাংলার এক বিখ্যাত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ডি-ফ্যাক্টো ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হয়েও আপনি এই হতভাগ্য কলমজীবিকে হাজার মাইল দূরে গিয়েও ভুলতে পারেননি, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কলকাতা গেলে টেলিফোন করব। দারোয়ান ঢুকতে দিলে দেখা করার চেষ্টা করব।*

প্রীতিমুগ্ধ

'দিল্লী থেকে বলছি'

*রচনার চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক